মাঠ ফসল

ইউনিট ৭

ভূমিকা

মাঠ ফসল অন্যান্য ফসলের চেয়ে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। চাষযোগ্য জমির অধিকাংশ ব্যবহৃত হয় মাঠ ফসল উৎপাদনের জন্য। মাঠ ফসল ধান, গম, পাট, আখ, সরিষা, ছোলা, ভুট্টা, মুসর, খেসারী, চীনা, কাউন ইত্যাদি। বাংলাদেশে মাঠ ফসলের সমগ্র চাষযোগ্য জমির শতকরা ৮০ ভাগই দানাজাতীয় ফসলের চাষ হয়ে থাকে। ডাল ও তেল জাতীয় ফসল অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশে ডালফসল হিসেবে মসুর, মুগ, মাসকালাই, খেসারী, অড়হর, মটর, ছোলা ইত্যাদি তেল জাতীয় ফসল হিসেবে সূর্যমুখি, সয়াবিন, সরিষা, তিল, তিশি, চিনাবাদাম ইত্যাদি চাষ করা হয়। ডাল জাতীয় ফসল মানুষ ও গবাদিপশু, পাখির আমিষের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। জাতীয় খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এর সুপারিশ অনুযায়ী দৈনিক ৫৮ গ্রাম ডাল শস্য খাওয়া উচিত। বাংলাদেশে অর্থকরি ফসল হিসেবে চিনি জাতীয় ফসলও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আখ ও সুগারবিট চিনিজাতীয় ফসলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আঁশ ফসল দিয়ে বস্ত্র, চট, থলে, কার্পেট ও অনেক শৌখিন দ্রব্য তৈরি করা হয়। বস্ত্রের প্রধান কাঁচামাল হলো তুলা। এসব মাঠ ফসলের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এই ইউনিটে দানা জাতীয় ফসল, ডাল জাতীয়, তেল জাতীয় ফসল, চিনি ও আঁশ জাতীয় ফসল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -৭.১ : ধান চাষ
পাঠ -৭.২ : ধানের পোকামাকড় এবং দমন ব্যবস্থা রোগ বালাই
পাঠ -৭.৩ : ডাল ফসল : মসুর ও মুগডাল চাষ
পাঠ -৭.৪ : তেল ফসল : সূর্যমুখী চাষ
পাঠ -৭.৫ : তেল ফসল : সয়াবিন চাষ
পাঠ -৭.৬ : চিনি ফসল : আখ চাষ
পাঠ -৭.৭ : আঁশফসল : পাট চাষ
পাঠ -৭.৮ : আঁশফসল : তুলা চাষ
পাঠ -৭.৯ : ব্যবহারিক : সুস্থ বীজ বাছাইকরণ

পাঠ-৭.১ দানা ফসল : ধান চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধান উৎপাদন মৌসুম সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মৌসুম ভেদে ধানের বিভিন্ন জাতের নাম বলতে পারবেন;
- ধানের বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ধান উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ধান লাগানোর সময় বর্ণনা করতে পারবেন;
- বীজতলায় চারা তৈরি ও পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ধান রোপনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধান চাষে পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধান কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আউশ, আমন, বোরো ধান, উচ্চফলনশীল জাত, ভাসমান বীজতলা, ডাপোগ বীজতলা।

ধান বাংলাদেশের প্রধান দানাজাতীয় ফসল এবং প্রধান খাদ্য। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। বিশ্বের প্রধান প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ হলো চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ। বিশ্বের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯২ শতাংশ ধান এশিয়ার এ দেশগুলোতে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া, জলবায়ু সব কিছুই ধান চাষের উপযোগী। চাষাবাদের মৌসুম অনুযায়ী ধানের চাষ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. আউশ ধান (Aus rice): খরিপ ১ মৌসুমে এ ধান মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত চাষ করা হয়।
২. আমন ধান (Aman rice): খরিপ ২ মৌসুমে জুন থেকে ডিসেম্বর মাসে পর্যন্ত চাষ করা হয়।
৩. বোরো ধান (Boro rice): রবি মৌসুমে নভেম্বর থেকে মে মাসে এ ধান চাষ করা হয়।

বাংলাদেশের মোট ধানী জমির শতকরা প্রায় ১১ ভাগ জমিতে আউশ, ৪১ ভাগ জমিতে বোরো ও ৪৮ ভাগ জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। উৎপাদন হয় বোরোতে শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ, আমান ৪২ ভাগ ও আউশে ১০ ভাগ। বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদনশীলতা বেশি।

ধানের জাত

বাংলাদেশে প্রধানত দু'জাতের ধান দেখা যায়।

১. স্থানীয় জাত এবং
২. উচ্চ ফলনশীল জাত (উফশী জাত)

স্থানীয় জাতের বৈশিষ্ট্য :

১. এ জাত সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করা হয়।
২. ধান গাছ লম্বা হয় তাই হেলে পড়ে।
৩. পাতা লম্বাটে, হেলে পড়ে।
৪. কান্ড নরম এবং কুশির সংখ্যা কম।

৫. রোগ ও পোকা মাকড় আক্রমনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।
৬. এ জাতের ফলন কম, হেক্টর প্রতি ১.৫-২.৫ টন।
৭. জীবনকাল বেশি।
৮. মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করার ক্ষমতা কম।

স্থানীয় জাতের উদাহরণ:
আউশ মৌসুমে : কটকতারা, হাসিকলমি, ধারিয়াল
আমন মৌসুমে : হরিনমুদা, লাল মোটা, সাদা মোটা, কালিজিরা
বোরো মৌসুমে : দুধসর, বাজাইল, হবিগঞ্জ ইত্যাদি

উফশী জাতের বৈশিষ্ট্য :
১. গাছ শক্ত ও খাটো হয় ফলে সহজে হেলে পড়ে না।
২. পাতা সরু, খাটো ও খাড়া হয়।
৩. মাটি থেকে বেশি পরিমানে পুষ্টি উপাদান গ্রহন করতে পারে।
৪. ধান পাকার পরও পাতা সবুজ থাকে।
৫. উফশী ধানে রোগ ও পোকার আক্রমন কম হয়।
৬. কুশির সংখ্যা বেশি ফলে ফলনও বেশি।
৭. জাত বিশেষে বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়।
৮. ফলন অনেক বেশি; মৌসুম ভেদে হেক্টর প্রতি ফলন ৩.৫-৫.৫ টন, কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি।

বাংলাদেশে মোট ৮১টি উফশী জাত রয়েছে যার মধ্যে ৭৫টি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং ১৬টি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। নিচের তালিকাতে এর জাতগুলির নাম, জন্মানোর মৌসুম, গড় জীবনকাল, গড় ফলন এবং চালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
বিআর ১ (চান্দিনা)	বোরো আউশ	১৫০ ১২০	৫.৫ ৪.০	চাল খাটো মোটা
বিআর ২ (মালা)	বোরো আউশ	১৬০ ১২৫	৫.০ ৪.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
বিআর ৩ (বিপ্লব)	বোরো আউশ আমন	১৭০ ১৩০ ১৪৫	৬.৫ ৪.০ ৪.০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে সাদা দাগ আছে।
বিআর ৪ (ব্রিশাইল)	আমন	১৪৫	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ৫ (দুলাভেগ)	আমন	১৪৫	৩.০	চাল ছোট, গোলাকৃতি ও সুগন্ধি
বিআর ৬	বোরো আউশ	১৪০ ১১০	৪.৫ ৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা
বিআর ৭ (ব্রিবালাম)	বোরো আউশ	১৫৫ ১৩০	৪.৫ ৩.৫	চাল লম্বা, চিকন
বিআর ৮ (আশা)	বোরো আউশ	১৬০ ১২৫	৬.০ ৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে দাগ আছে, শিলাবৃষ্টি প্রবন এলাকার উপযোগী

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
বিআর ৯ (সুফলা)	বোরো আউশ	১৫৫ ১২০	৬.০ ৫.০	চাল লম্বা, মাঝারি মোটা ও সাদা এবং শিলা বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় উপযোগী
বিআর ১০ (প্রগতি)	আমন	১৫০	৫.৫	চাল মাঝারি চিকন
বিআর ১১ (মুক্তা)	আমন	১৪৫	৬.৫	চাল মাঝারি মোটা
বিআর ১২ (ময়না)	বোরো আউশ	১৭০ ১৩০	৫.৫ ৪.৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ১৪ (গাজী)	বোরো আউশ	১৬০ ১২০	৬.০ ৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ১৫ (মোহিনী)	বোরো আউশ	১৬৫ ১২৫	৫.৫ ৫.০	চাল মাঝারি চিকন, সাদা
বিআর ১৬ (শাহী বালাম)	বোরো আউশ	১৬৫ ১৩০	৬.০ ৫.০	চাল লম্বা চিকন, সাদা
বিআর ১৭ (হাসি)	বোরো	১৫৫	৬.০	চাল মাঝারি মোটা
বিআর ১৮ (শাহজালাল)	বোরো	১৭০	৬.০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও হাওড় অঞ্চলে উপযোগী
বিআর ১৯ (মঙ্গল)	বোরো	১৭০	৬.০	চাল মাঝারি মোটা ও হাওড় অঞ্চলের উপযোগী
বিআর ২০ (নিজামী)	আউশ	১১৫	৩.৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২১ (নিয়ামত)	আউল	১১০	৩.০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২২ (কিরণ)	আমন	১৫০	৫.০	চাল খাটো, মোটা ও নাবী জাত
বিআর ২৩ (দিশারী)	আমন	১৫০	৫.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবী জাত
বিআর ২৪ (রহমত)	আউশ	১০৫	৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২৫ (নয়াপাজাম)	আমন	১৩৫	৪.৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা
বিআর ২৬ (শ্রাবণী)	আউশ	১১৫	৪.০	চাল চিকন, লম্বা ও সাদা এবং এ্যামাইলেজ কম
ব্রি ধান ২৭	আউশ	১১৫	৪.০	চাল মাঝারি চিকন ও মোটা এবং বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী
ব্রি ধান ২৮	বোরো	১৪০	৬.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ২৯	বোরো	১৬০	৭.৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ৩০	আমন	১৪৫	৫.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ৩১	আমন	১৪০	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৩২	আমন	১৩০	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৩৩	আমন	১১৮	৪.৫	চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে
ব্রি ধান ৩৪	আমন	১৩৫	৩.৫	চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৩৫	বোরো	১৫৫	৫.০	চাল খাটো, মোটা ও বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী
ব্রি ধান ৩৬	বোরো	১৪০	৫.০	চাল লম্বা, চিকন, ঠান্ডা এবং সহনশীল
ব্রি ধান ৩৭	আমন	১৪০	৩.৫	চাল মাঝাারি, চিকন ও সুগন্ধি

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
ব্রি ধান ৩৮	আমন	১৪০	৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৩৯	আমন	১২২	৪.৫	চাল লম্বা ও চিকন
ব্রি ধান ৪০	আমন	১৪৫	৪.৫	চাল মাঝাারি, মোটা ও লবণ সহনশীল
ব্রি ধান ৪১	আমন	১৪৮	৪.৫	চাল লম্বাটে মোটা ও লবণ সহনশীল
ব্রি ধান ৪২	আউশ	১০০	৩.৫	চাল মাঝাারি, সাদা ও খরা সহনশীল
ব্রি ধান ৪৩	আউশ	১০০	৩.৫	চাল মাঝাারি, সাদা ও খরা সহনশীল
ব্রি ধান ৪৪	আমন	১৪৫	৫.৫	চাল মোটা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী
ব্রি ধান ৪৫	বোরো	১৪০	৬.৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৪৬	আমন	১৫০	৪.৭	চাল মাঝারি, নাবি জাত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণযোগ্য
ব্রি ধান ৪৭	বোরো	১৫২	৬.০	চাল মাঝারি মোটা, চারা অবস্থায় লবণ সহনশীলতা ১২-১৪ ডিএস/মিটার এবং বাকি জীবনকালে ৬ ডিএস/মিটার
ব্রি ধান ৪৮	আউশ	১১০	৫.৫	চাল মাঝারি মোট, ভাত ঝরঝরে
ব্রি ধান ৪৯	আমন	১৩৫	৫.৫	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫০	বোরো	১৫৫	৬.০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৫১	আমন	১৪২ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৪ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	৪.৫	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা
ব্রি ধান ৫২	আমন	১৪৫ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৫ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	৪.০	চাল মাঝারি মোটা
ব্রি ধান ৫৩	আমন	১২৫	৫.০	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫৪	আমন	১৩৫	৪.৫	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫৫	বোরো আউশ	১৪৫ ১০৫	৭.০	চাল লম্বা ও চিকন
ব্রি ধান ৫৬	আমন	১১০	৫.০	চাল লম্বা ও সাদা
ব্রি ধান ৫৭	আমন	১০৫	৪.৫	চাল লম্বা ও সরু
ব্রি ধান ৫৮	বোরো	১৫৫	৭.২	চাল অনেকটা ব্রি ধান ২৯-এর মতো, তবে সামান্য চিকন
ব্রি ধান ৫৯	বোরো	১৫৩	৭.১	চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না
ব্রি ধান ৬০	বোরো	১৫১	৭.৩	চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা
ব্রি ধান ৬১	বোরো	১৫০	৬.৩	চাল মাঝারি সরু, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল
ব্রি ধান ৬২	আমন	১০০	৫.৫	চাল লম্বা, সরু এবং সাদা, মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ আগাম জাত
ব্রি ধান ৬৩	বোরো	১৫০	৭.০	চাল লম্বা ও সরু
ব্রি ধান ৬৪	বোরো	১৫২	৬.০	চাল মাঝারি মোটা এবেং উষ্ণ মাত্রায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
ব্রি ধান ৬৫	আউশ	৯৯	৩.৫	চাল মাঝারি চিকন, সাদা, ডিগ পাতা খাড়া এবং গাছ ছোট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না এবং খরা সহিষ্ণু
ব্রি ধান ৬৬	আমন	১১৩	৪.৫	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ
ব্রি ধান ৬৭	বোরো	১৪৩	৬.০	চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল
ব্রি ধান ৬৮	বোরো	১৪৯	৭.৩	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ধান পাকার সময় ডিগ পাতা সবুজ থাকে
ব্রি ধান ৬৯	বোরো	১৫৩	৭.০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং উপকরণ সাশ্রয়ী জাত
ব্রি হাইব্রিড ধান ১	বোরো	১৫৫	৮.৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা
ব্রি হাইব্রিড ধান ২	বোরো	১৪৫	৮.০	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম
ব্রি হাইব্রিড ধান ৩	বোরো	১৪৫	৯.০	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম
ব্রি হাইব্রিড ধান ৪	আমন	১১৮	৬.৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা
ইরাটম-২৪	বোরো আউশ	১৪০-১৪৫ ১২৫-১৩৫	৬.০ ৩.৫	উচ্চ ফলনশীল, আগাম পাকে
বিনা শাইল	আমন	১৩৫-১৪০	৪.২	নাবী রোপন উপযোগী
বিনা ধান-৪	আমন	১৩০-১৩৫	৪.৭	চাল লম্বা, আগাম পাকে, চাল চিকন
বিনা ধান-৫	বোরো	১৫০-১৫৫	৭.০	উচ্চ ফলনশীল এবং চাল মোটা
বিনা ধান-৬	বোরো	১৬০-১৬৫	৭.৫	সর্বোচ্চ ফলনশীল এবং চাল মোটা
বিনা ধান-৭	আমন	১১৫-১২০	৫.০	চাল সরু ও লম্বা, মঙ্গা মোকাবিলায় কুবই কার্যকর
বিনা ধান-৮	বোরো আমন	১৩০-১৩৪	৪.৫ ৪.০	লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত
বিনা ধান-৯	আমন	১২০-১২৫	৩.৭৫	সুগন্ধি, লম্বা, চিকন ও আগাম জাত
বিনা ধান- ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫	বোরো	১২৫-১৩০	৫.৫	গাছ মধ্যম খাটো, চাল লম্বা ও মাঝারি, লবণ সহিষ্ণু

জলবায়ু

ব্যাপক ও বিস্তৃত জলবায়ুতে ধান চাষ করা যায়। ধান চাষের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা ২০-৩৫°সে. ডিগ্রি। এর মধ্যে বীজ অংকুরোদগমের জন্য ৩০-৩৫° সেন্টিগ্রেড। অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য ২৫-৩১°সে. পুস্পায়নের জন্য ৩০-৩৩°সে. এবং পরিপক্কতার জন্য ২০-২৯° তাপমাত্রা উপযোগী। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৫-৯৫%। মাঝারি বৃষ্টিপাত ও উজ্জ্বল সূর্যালোক ধান চাষের জন্য প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত কম হলে সেচের মাধ্যমে পানির চাহিদা পূরণ করতে হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০% এর কম ও ৯৫% এর বেশি হলে পুস্পায়ন ব্যহত হয়।

মাটি ও ভূমি বন্ধুরতা

ভারী বুনটের মাটি যার পানি ধারন ক্ষমতা বেশি এবং যে মাটি অর্ধজলাবস্থার উপযোগী তা ধান চাষের জন্য ভালো। তবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিও ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। মাটিতে ৪০-৬০% কর্দম কনা থাকলে ভালো হয়।

সেচ ও নিস্কাশন ব্যবস্থা থাকলে যে কোন মাটিতেই ধান চাষ করা যায়। উঁচু, মাঝারি উঁচু ও নিচু সব ধরনের জমিতেই ধান চাষ করা যায়। তবে মাঝারি উঁচু জমি উত্তম। মাটির অম্লমান ৫.০-৬.০ উত্তম।

ধানের আধুনিক চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে ধানের চাষ করা হয়। এর মধ্যে ধানের জমি শতকরা ১১ ভাগ আউশ, ৪৮ ভাগ আমন ও ৪১ ভাগ বোরো ধান চাষ করা হয়। কিন্তু উৎপাদনের দিক থেকে বোরো শতকরা ৪৮ ভাগ, আমন ৪২ ভাগ ও আউশ ১০ ভাগ। বোরো মৌসুমে ধান চাষ হয় সবচেয়ে বেশি এবং আউশে সবচেয়ে কম। তিন মৌসুমে ধান চাষ প্রায় একই রকম। নিম্নে ধান চাষের আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

জমি নির্বাচন

আউশ ধান চাষের জন্য উঁচু, মাঝারি উঁচু ও নিচু জমি উপযোগী। মাটির বুনট পলি দোঁআশ, পলি এঁটেল ও এটেঁল হলে ভালো। মাঝারি উঁচু ও নিচু জমিতে রোপা আমন চাষ করা যায়। তবে সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে উঁচু জমিতেও রোপা আমন ধান চাষ করা যায়। দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ ও এঁটেল মাটি আমন ধান চাষের জন্য উপযোগী। ভারী বুননের মাটি যার পানি ধারন ক্ষমতা বেশি এবং যে মাটি অর্ধ-জলাবস্থায় উপযোগী তা বোরো ধান চাষের জন্য উত্তম। মাটিতে ৪০-৬০% কর্দম কনা থাকলে ভাল হয়। সেচের ব্যবস্থা থাকলে উঁচু, মাঝারি উঁচু এবং নিচু যে কোন জমিতেই বোরো ধান চাষ করা যায়। মাটির অম্লমান (pH) ৫.০ হতে ৬.০ হলে ভাল।

জাত নির্বাচন

ভূমির প্রকার, কৃষি পরিবেশিক অবস্থা এবং রোপনের সময়ের উপর ভিত্তি করে ধানের জাত নির্বাচন করতে হয়। রোপা আউশ ধান চাষের জন্য বিআর ২৬ (শ্রাবনী) ও ব্রিধান ৪৮ এবং অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে ব্রিধান ২৭ নির্বাচন করতে হয়। বোনা আউশ ধান বৃষ্টিবহুল এলাকার জন্য বিআর ২১ (নিয়ামত), বিআর ২৪ (রহমত) ও ব্রিধান ২৭ এবং খরাপ্রবণ এলাকার জন্য ব্রিধান ৪২ এবং ব্রিধান ৪৩ নির্বাচন করতে হয়।

নিচু জমির জন্য জলমগ্নতা সহনশীল জাত যেমন ব্রিধান ৫১, ব্রিধান ৫২, বৃষ্টি নির্ভর রোপা আমনের জন্য খরাসহিষ্ণু জাত যেমন ব্রিধান ৫৫; নাবী আমনের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রিধান ৪৬; লবনাক্ততা সহনশীল জাত ব্রিধান ৪০, ব্রিধান ৪১, ব্রিধান ৫৩, ব্রিধান ৫৫; সুগন্ধি চালের জন্য বিআর ৫, ব্রিধান ৩৪, ব্রিধান ৫০ ইত্যাদি।

আগাম বোরো ধানের জাত শীতসহিষ্ণু হলে ভালো যেমন ব্রিধান ৩৬; হাওড় অঞ্চলের জন্য বিআর ১৭, বিআর ১৮, বিআর ১৯ ভালো; লবনাক্ততা সহিষ্ণুজাত যেমন ব্রি-ধান ৫৫, ব্রিধান ৬১, ব্রিধান ৬৭, বিনাধান ৮, বিনাধান ১০, বিনাধান ১১, বিনাধান ১২, বিনাধান ১৩, বিনাধান ১৪ ও বিনাধান ১৫। এছাড়া বিশেষ পুষ্টিগুন সম্পন্ন জাত যেমন জিংক সমৃদ্ধ জাত ব্রিধান ৬২, ব্রিধান ৬৩, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ জাত ব্রিধান ৬৬।

বীজতলা তৈরি

দোআঁশ ও এটেঁল মাটি যেখানে প্রচুর আলো বাতাস আছে এমন জমি বীজতলার জন্য উপযোগী। বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। তবে অনুর্বর জমি হলে প্রতি বর্গমিটার ২ কেজি হারে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এর পর জমিতে ৫-৬ সে.মি. পানি দিয়ে দু-তিনটি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন পানি বদ্ধ অবস্থায় রেখে দিতে হবে। জমিতে ব্যবহৃত জৈব সার পচে গেলে পুনরায় চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। একটি আদর্শ বীজতলায় ৪টি বেড থাকবে। প্রতিটি জমির দৈর্ঘ্য বরাবর এক মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে এবং দু-বেডের মাঝে ২৫-৩০ সে.মি. ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে। বেডের উপরের মাটি কাঠ বা বাঁশ দিয়ে সমান করে নিতে হয়। বেডের মধ্যবর্তী নালা সেচ ও নিস্কাশন এবং চারার পরিচর্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। মৌসুম ভেদে ধানের চারা উৎপাদনের জন্য চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা যায়। যেমন- (১) শুকনো বীজতলা (২) কাদাময় বীজতলা (৩) ভাসমান বীজতলা ও (৪) ডাপোগ বীজতলা।

(১) শুকনো বীজতলা

মাটির উপযুক্ত আর্দ্রতা অর্থাৎ জো অবস্থায় ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করা হয়। এরপর জমির দৈর্ঘ্য বরাবর ১ মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হয়। দু-বেডের মাঝে ২৫-৩০ সে.মি. চওড়া জায়গার মাটি বেডের উপর উঠিয়ে দিতে

হবে। এতে প্রতিটি বেড ১৫ সে.মি. উচু হবে এবং মাঝের ফাঁকা জায়গাটি নালার আকার ধারন করবে। এই নালা পরবর্তীতে সেচ ও নিস্কাশন এবং বীজতলার পরিচর্যার কাজে লাগবে। এরপর মাটি ভালভাবে সমান করে শুকনো বীজ বপন করা হয়।

(২) কাদাময় বীজতলা

উর্বর দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটি এ বীজতলার জন্য উত্তম। জমিতে দাড়ানো পানি থাকলে ভাল তা না হলে সেচের মাধ্যমে ৫-৬ সে.মি. পানি দিয়ে ২-৩ বার চাষ ও মই দিয়ে এক সপ্তাহ পানিসহ রেখে দিতে হয়। এর ফলে আগাছা ও খড় পচে যাবে। এরপর আবার চাষ ও মই দিয়ে কাদাময় বীজতলা তৈরি করতে হয়। শুকনো বীজতলার মতো করেই বেড তৈরি করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বীজতলায় কাদা বেশি না হয়। কাদা বেশি হলে বীজ ডুবে যাবে এবং বীজ ভালভাবে গজাবে না। এ রকম অবস্থা হলে বেড তৈরির ৩-৪ ঘন্টা পর বীজ বপন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাগ দেয়া অংকুরিত বীজ বপন করতে হয়।

চিত্র ৭.১.১ : ধানের বীজতলা

(৩) ভাসমান বীজতলা

আমন মৌসুমে বিশেষ অবস্থার মোকাবেলার জন্য ভাসমান বীজতলা তৈরি করা হয়। বন্যাজনিত কারনে বীজতলা করার জায়গা পাওয়া না গেলে ভাসমান বীজতলায় চারা উৎপন্ন করা যায়। বন্যাকবলিত জমি, পুকুর, ডোবা বা খালের পানির উপর বাঁশের মাচা বা কলাগাছের ভেলা তৈরি করে তার উপর ২-৩ সে.মি. উঁচু কাদার প্রলেপ দিয়ে কাদাময় বীজতলার মত ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যায়। এ বীজতলায় কাদাময় বীজতলার মতই অংকুরিত বীজ বুনতে হয়। বীজতলা যাতে বন্যার পানিতে ভেসে না যায় এজন্য এটি খুটির সাথে বেঁধে রাখতে হয়।

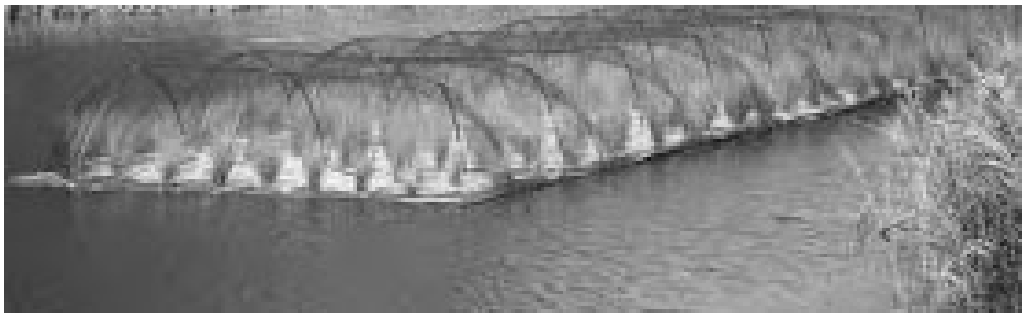

চিত্র ৭.১.২ : ধানের ভাসমান বীজতলা

(৪) ডাপোগ বীজতলা

বন্যাকবলিত এলাকায় চারা উৎপাদনের আরেকটি কৌশল হলো ডাপোগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পাকা অথবা কাঁচা বারান্দা, করিডোর, বাড়ির উঠান অথবা যে কোন শুকনো জায়গায় ডাপোগ বীজতলা তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত স্থানে চারিদিকে মাটি, ইট, কাঠ বা কলাগাছের বাকল দিয়ে ঘিরে নিতে হবে। তারপর কলাপাতা বা পলিথিন বিছিয়ে তার উপর ঘন করে অংকুরিত বীজ বপন করতে হয়। বীজে সঞ্চিত খাদ্যই চারার প্রাথমিক খাবার। তাই এই চারার বয়স ১৫-১৮ দিন হলেই রোপন করতে হয়। এ বীজতলায় মাটি থাকে না তাই ৫-৬ ঘন্টা পর পর পানি দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন বেশি পানি জমে না থাকে।

বীজতলায় বীজ বপনের সময়

রোপা পদ্ধতিতে আউশ ধান চাষের জন্য এপ্রিল মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। চারার বয়স ২০-২৫ দিন হলে মূল জমিতে রোপন করতে হয়। বোনা আউশ ধানের বীজ মধ্য মার্চ থেকে মে এর প্রথম সপ্তাহে জমিতে বপন করতে হয়। রোপা আউশ চাষের জন্য বীজতলায় মধ্য এপ্রিল থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বীজতলায় বীজ ফেলতে হয়। রোপা আমন ধান ১৫ই জুলাই হতে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত মুল জমিতে রোপন করা হয়। কাজেই রোপন সময়ের একমাস আগে বীজতলায় বীজ বুনতে হবে যেন রোপনের সময় চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হয়। বোরো ধানের ক্ষেত্রে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বীজতলায় বীজ ফেলতে হয় এবং চারার বয়স ৪০-৪৫ দিন হরে রোপন করতে হয়।

বীজের পরিমান

বীজের পরিমান নির্ভর করে বপন অথবা রোপন দূরত্ব, বীজের আকার ও আয়তন ইত্যাদির উপর। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সে.মি. হলে বীজ প্রয়োজন ৫০-৬০ কেজি/হেক্টর। ডিবলিং পদ্ধতিতে বপনের ক্ষেত্রে ২৫ সে.মি. দূরে দূরে সারি ও ২০ সে.মি. দূরে দূরে বীজ বপন করলে বীজের প্রয়োজন হয় ৩০-৩৫ কেজি/হেক্টর। রোপা আউশের জন্য বীজতলায় চারা তৈরিতে বীজের প্রয়োজন ২০-৩০ কেজি/হেক্টর।

বীজ বাছাই

ভালো ফলনের জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে ভালো বীজ। বপনের জন্য সুস্থ ও পুষ্ট বীজ নির্বাচন করতে হবে। এজন্য দশ লিটার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে নিয়ে এ দ্রবনে ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিয়ে পুষ্ট বীজ নীচে জমা হবে। অপুষ্ট হাল্কা বীজ ভেসে উঠবে। ভারীগুলো ভালোভাবে পরিস্কার পানিতে ৩-৪ বার ধুয়ে নিতে হবে।

বীজ শোধন ও জাগ দেওয়া

বাছাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পরিপুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রাখলে জীবানুমুক্ত হয়। বীজ শোধনের জন্য ২-৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এক কেজি পরিমান বীজ ডুবিয়ে ১২ ঘন্টা রেখে দিতে হয়। এরপর বীজ পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘন্টা বা দুই দিন ও বোরো মৌসুমে ৭২ ঘন্টা বা তিন দিনের বীজের অংকুর বের হয় এবং তা বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হয়।

বীজতলায় বীজ বপন

শুকনো বীজতলার জন্য প্রতি বর্গমিটার ১৫০ গ্রাম শুকনো বীজ বুনতে হয়। বীজ ছিটিয়ে বোনার পর বীজগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ভেজা বীজতলায় প্রতি বর্গমিটার ৮০-১০০ গ্রাম হারে বীজ বপন করতে হয়। এক বর্গমিটার বীজতলার চারা দিয়ে ২০-৩০ বর্গমিটার রোপন করা যায়। তবে ডাপোগ বীজতলায় ঘন করে বীজ বুনতে হয় প্রতি বর্গমিটারে ২.৫-৩.০ কেজি বীজ। শুকনো বীজতলায় শুকনো বীজ বুনতে হয়। কিন্তু অন্যগুলিতে অংকুরিত বীজ বুনতে হয়। এজন্য বীজ জাগ দেয়ার প্রয়োজন হয়। ভেজা বীজতলায় বীজ বপনের পর ৪-৫ দিন পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হয়।

বীজতলার পরিচর্যা

বীজতলায় নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে। চারা হলদে হলে প্রতি বর্গমিটার ৭ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পরও চারা সবুজ না হলে সালফারের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম হারে জিপসাম সার ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া বীজতলায় পোকামাকড় ও রোগবালাই এর উপদ্রব হলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

জমি তৈরি

জমির জো অবস্থা থাকলে মার্চ-এপ্রিল মাসে আউশ ধানের বীজ বপন করা যায়। জমিতে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে ২-৩টি চাষ ও মই দিয়ে জমি কাদাময় করতে হয়। আউশ ধানে আগাছার প্রকোপ বেশি হয় বলে প্রথম চাষের পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এর ফলে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে যাবে। রোপা আউশের জন্য মধ্য এপ্রিল থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি বা সেচের পানির সহায়তায় কর্দমাক্ত করে জমি প্রস্তুত করতে হয়। রোপা আমনের জন্য মধ্য জুন থেকে মধ্য আগস্ট এ সময়ের মধ্যে বৃষ্টি বা সেচের পানির সাহায্যে জমি প্রস্তুত করা হয়। বোরো ধানের

জন্য মধ্য ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী এ সময়ের মধ্যে সেচের পানির সাহায্যে থকথকে কর্দমাক্ত করে জমি তৈরি করতে হয়। জমি তৈরির সময় জমির উপরিভাগ ভালভাবে সমতল করতে হয় যাতে সেচের পানি সব জায়গায় পৌছে।

সার ব্যবস্থাপনা

সারের মাত্রা আবহাওয়া, মাটি, ধানের জাত, জীবনকাল, ফলন দেয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ভালো ফলনের জন্য সময়মত ও পরিমানমত সার প্রয়োগ করতে হয়। নিচে মৌসুম ভেদে ধানের বিভিন্ন জাতের সারের পরিমান দেয়া হলো:

মৌসুম	ধানের জাত	বিভিন্ন সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)				
		ইউরিয়া	টি.এস.পি	পটাশ	গন্ধক	দস্তা
বোনা আউশ	বিআর ২০, বিআর ২১, বিআর ২৪, ব্রিধান ২৭	১৩০	৯০	৭০	৬০	১০
রোপা আউশ	বিআর ১, বিআর ৩, বিআর ৭, বিআর ৮, বিআর ৯, বিআর ১২, বিআর ১৪, বিআর ১৫, বিআর ১৬, বিআর ২৬, ব্রিধান ২৭	১৩৫ হতে ১৫০	১০০	৭০	৬০	১০
রোপা আমন	বিআর ৩, বিআর ৪, বিআর ১০, বিআর ১১, বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রিধান ৩০, ব্রিধান ৩১	১৮০	১০০	৭০	৬০	১০
	বিআর ৫, বিআর ২৫, ব্রিধান ৩২, ব্রিধান ৩৩, ব্রিধান ৩৪, ব্রিধান ৩৭, ব্রিধান ৩৮, ব্রিধান ৩৯	১৫০	১০০	৭০	৬০	১০
বোরো	বিআর ১, বিআর ৬, ব্রিধান ২৮, ব্রিধান ৩৬	২২০	১২০	৮৫	৬০	১০
	বিআর ৩, বিআর ৮, বিআর ৯, বিআর ১২, বিআর ১৪, বিআর ১৫, বিআর ১৬, ব্রিধান ২৯, ব্রিধান ৩৫	২৭০	১৩০	১২০	৭০	১০
	বিআর ১৭, বিআর ১৮, বিআর ১৯	১৩৫	১০০	৭০	৬০	১০

জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা নির্ধারন করা হয়। এছাড়া জমিতে গোবর বা আর্বজনা পচা সার হেক্টর প্রতি ৮-১০ টন ব্যবহার করা হলে রাসায়নিক সারের মাত্রা প্রায় অর্ধেক নামিয়ে আনা সম্ভব। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সব সার জমি তৈরির সময় শেষে চাষের পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় বলে ইউরিয়া সার ধাপে ধাপে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সারকে সমান তিনভাগে ভাগ করে চারা রোপনের ১০-১৫, ৩০-৩৫ ও ৪৫-৫০ দিন পর জমিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে :

- সার দেয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা প্রয়োজন, শুকনো জমিতে অথবা অতিরিক্ত পানি থাকলে সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়।
- সারের উপরি প্রয়োগের পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিস্কার করলে অথবা হাত দিয়ে মিশিয়ে দিলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
- শেষ কিস্তির সার ধানের কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করা উচিত।
- ইউরিয়া সারের প্রভাব পরবর্তী ফসলে থাকে না বলে প্রত্যেক ফসলেই মাত্রানুযায়ী ইউরিয়া ব্যবহার করতে হবে।

- ইউরিয়া প্রয়োগের পরও ধান গাছ যদি হলদে দেখায় তবে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

চারা উঠানো

চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলায় বেশি করে পানি দিয়ে মাটি নরম করে নিতে হবে। খুব যত্ন সহকারে চারা তুলতে হবে যাতে শিকড় ও কান্ড ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। চারাগুলো ছোট ছোট আঁটি করে বেঁধে নিতে হবে। চারা তোলার পর কোনো কারনে লাগানো না গেলে চারার আঁটিগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে ছিপছিপে পানিতে রাখতে হবে।

চারা রোপন

রোপা আউশ ও আমনের চারা ২০-২৫ দিন বয়সে লাগাতে হয়। কিন্তু বোরোর ক্ষেত্রে একটু বেশি বয়সের ৪০-৪৫ দিনের চারা রোপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সে.মি ও গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি। চারা মাটির ২-৩ সে.মি. গভীরে রোপন করতে হয়। এর চেয়ে বেশি গভীরতা হলে গাছে কুশি উৎপাদন কমে যায়। সারি করে চারা লাগালে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা সহজ হয়।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

রোপা ধানে সবসময় দাড়ানো পানি রাখার দরকার নেই। চারা রোপনের পর ৬-৭ সে.মি. পানি রাখতে হবে। চারা রোপনের ৬-৭ দিন পর্যন্ত ৩-৫ সে.মি. সেচ দিলে আগাছা দমন হয়। কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২-৩ সে.মি. এবং থোর আসার সময় ৭-১০ সে.মি. সেচ দেয়া উত্তম। দানা পুষ্ট হওয়া শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না।

রোপা আমন সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর। আমন মৌসুমে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির পানি যেন সরাসরি জমির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে না পারে এজন্য উচু আইল তৈরি করে দিতে হয়। কারণ বৃষ্টির পানি জমির পুষ্টি উপাদান ধুয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে পরিবর্তিত জলবায়ুতে বৃষ্টির সময় কাল পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেখা যায় রোপনের সময় বৃষ্টির পানির অভাবে জমি তৈরি করা যায় না অথবা অতি বৃষ্টির জন্য জমিতে অনেক দাড়ানো পানি থাকে যার জন্য চারা রোপন করা যায় না। বর্তমানে রোপা আমনে সম্পূরক সেচ বিশেষ করে শীষ উদগম থেকে দানা পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়ে প্রয়োগ করে ফসল ফলানো হয়। এতে ফলন বেড়ে যায়।

মাঠ পর্যায়ে কৃষক বোরো ধান চাষে ২৫-৩০ বার সেচ প্রদান করে যা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। বোরো ধান চাষে একবার ৫-৭ সে.মি. পানি দেয়ার পর জমিতে দাড়ানো পানি শেষ হওয়ার তিন দিন পর পুনরায় সেচ দিলে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ পানি কম লাগে। বোরো চাষে পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিতে (AWD) সেচ দিলে গাছে মূলের বৃদ্ধি ভালো হয় ও সেচ খরচ ও কমানো যায়।

আগাছা দমন

সাধারণত বোরো ও রোপা আমনের চেয়ে আউশ মৌসুমে বিশেষ করে বোনা আউশে আগাছার উপদ্রব বেশি হয়। এজন্য আউশ মৌসুমে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর জমিতে দু-একটি চাষ দিয়ে পতিত রাখলে আগাছার বীজ গজিয়ে উঠে। কিছুদিন পর পুনরায় মই দিয়ে ধান বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। রোপা জমিতে ৫-১০ সে.মি. পানি রাখলে জমিতে আগাছা কম হয়। বোরো ধানে দাড়ানো পানি থাকে বলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। তারপরও আগাছা হলে আগাছা পরিস্কার করতে হয়। আগাছা পরিস্কারের সময় হাত দিয়ে মাটি নেড়ে দিলে বাতাস চলাচলের সুযোগ পায় যা গাছের মূলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। জমিতে দাড়ানো পানি না থাকলে আগাছার প্রকোপ বেড়ে যায়। সারিতে রোপনকৃত রোপা আমনে জাপানি রাইস উইডার দিয়ে আগাছা দমন করা যায়। আগাছানাশক প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যায়।

ধান কাটা, মাড়াই, শুকানো ও সংরক্ষণ

ধানের শিষের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ অংশের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে এবং ধানের রং সোনালি হলে ধান কাটতে হয়। ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ধান পরিপক্ক হবার পরপরই যত দ্রুত সম্ভব ধান কাটতে হবে। এরপর মাড়াই করে খড়কুটা বেছে পরিস্কার করে ধান পরপর ৪-৫ দিন শুকাতে হবে। শুকানোর সময় ধানের আর্দ্রতা ১২% এ চলে আসলে চিটা, আবর্জনা, ভাঙ্গা ধান, ধুলাবালি পরিস্কার করে নিতে হবে। এরপর ধান ছায়ায় ঠান্ডা করে ড্রামে, মটকায়, পলিকোটেড বায়ুরোধক পাত্রে রাখতে হবে।

ফলন

মৌসুম ভেদে ধানের ফলন ভিন্ন হয়। বোরো মৌসুমে ধানের ফলন সবচেয়ে বেশি ও আউশ মৌসুমে সবচেয়ে কম। উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরোতে গড়ে হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন, রোপা আমনে ৪-৫ টন এবং আউশে ৩-৪ টন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা আধুনিক ধানচাষের কলাকৌশল সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে লিখিত উপস্থাপন করবেন।

সারাংশ

ধান বাংলাদেশের প্রধান ফসল। এদেশে মোট আবাদী জমির প্রায় ৭৬% জমিতে ধান চাষ হয়। বাংলাদেশে আউশ, আমন, বোরের মৌসুমে ধান চাষ হয়ে থাকে। সেচ ব্যবস্থা থাকলে উঁচু, মাঝারী উঁচু জমিসহ নীচু জমিতে ধান চাষ করা সম্ভব। অধিক ফলানোর জন্য মৌসুম ও এলাকাভিত্তিক উপযুক্ত জাত নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। বীজের মান নিশ্চিত হয়ে মৌসুমের জন্য কম বয়সের চারা উৎপন্ন করে যথাসময়ে জমিতে চারা রোপণ করতে হবে। ধান উৎপাদনকালীন সময় বিভিন্ন আন্ত:পরিচর্যা যেমন: সেচ প্রদান আগাছা দমন, পোকামাকড়, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কার্যক্রম যথাযথভাবে করতে হবে। পরিপক্ক ধান কর্তনের পর উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় মাড়াই ও শুকানোর পর সঠিকপাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ধানের উফশী জাত কোনটি?
- ক) নাজির শাইল
- খ) বিরই
- গ) কাটারীভোগ
- ঘ) কিরণ।

২। ধান বীজ বপনের জন্য কত ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে?
- ক) ৬ ঘণ্টা
- খ) ১২ ঘণ্টা
- গ) ২৪ ঘণ্টা
- ঘ) ৪৮ ঘণ্টা।

৩। ধানের বীজতলা কয় ধরনের হয়ে থাকে?
- ক) ১
- খ) ২
- গ) ৩
- ঘ) ৪ ।

৪। ধানের বীজ সংরক্ষণে উপযুক্ত আর্দ্রতা কত?
- ক) ৫%
- খ) ১২%
- গ) ২৫%
- ঘ) ২০%।

পাঠ-৭.২ ধানের ক্ষতিকর ধানের পোকামাকড় ও রোগ বালাই এবং দমন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধানের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্ষতির ধরণ ও দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধানের বিভিন্ন রোগের কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- রোগ দমনে কার্যকরী ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পোকামাকড়, রোগবালাই, লক্ষণ, দমন ব্যবস্থা।

ধানের ক্ষতিকর পোকামাকড়

প্রায় ৩৩টি প্রজাতির পোকাকে ধানের প্রধান ক্ষতিকর পোকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিন মৌসুমেই প্রায় একই ধরনের পোকা আক্রমন করে যদিও আক্রমনের মাত্রা ভিন্ন। আউশ ও আমন মৌসুমে পোকার প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। নিচে কয়েকটি প্রধান পোকার ক্ষতির লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১। মাজরা পোকা (S:em borer)

ক্ষতির লক্ষণ

১) মাজরা পোকার মথ ধানের পাতায় ডিম পাড়ে।
২) ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে কান্ড ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে কান্ডের নীচের দিকে কেটে দেয়।
৩) আক্রমন শীষ বের হবার পূর্বে হলে 'ডেটহার্ট' এবং শীষ আসার সময় হলে 'হোয়াইট হেড' লক্ষণ প্রকাশ করে।

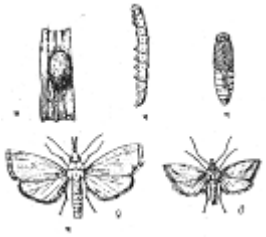

চিত্র ৭.২.১ : মাজরা পোকা

দমন ব্যবস্থা

১) ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলা।
২) আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।
৩) জমিতে ডালপালা পুঁতে পাখি বসবার ব্যবস্থা করা।
৪) জমিতে ১০-১৫% মরা ডগা অথবা শতকরা ৫% সাদা শীষ দেখা গেলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
৫) মাজরা পোকা প্রতিরোধী জাত যেমন বিআর-১, বিআর-১০, বিআর-১১, বিআর-২২, ব্রিশাইল ইত্যাদি চাষ করা।

২। গলমাছি বা নলিমাছি (Gallmidge)

ক্ষতির লক্ষণ

১) কীড়া ধান গাছের বাড়ন্ত কুশিকে আক্রমন করে এবং আক্রান্ত কুঁশি পিয়াজের মত হয়।
২) কুঁশিতে শীষ বের হয় না।

দমন ব্যবস্থা

১) রোপনের পর জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
২) আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা দমন করতে হবে।
৩) ৫% কুশি পিয়াজ পাতার মত হলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৩। পামরি পোকা (Rice hispa)

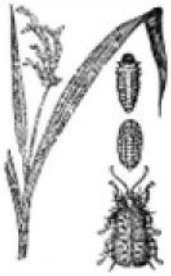

চিত্র ৭.২.২ : পামরি পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

১) পামরি পোকা পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ও কীড়া এ দু-অবস্থায় ধান গাছ আক্রমন করে।
২) কীড়া পাতা ছিদ্র করে সবুজ অংশ খায়।
৩) পূর্ণবয়স্ক পোকা ধানের পাতার উপর সমান্তরাল দাগ করে সবুজ অংশ কুরে কুরে খেয়ে ফেলে।
৪) পাতা শুকিয়ে পুড়ে যাওয়ার মত হয়।

দমন ব্যবস্থা

১) হাতজাল অথবা মশারিরর কাপড় দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে।
২) গাছের পাতা ছেঁটে দিয়ে কীড়া মারা যায়।
৩) পাতার ৩৫% ক্ষতি হলে অথবা প্রতি গোছায় ধানগাছে ৪টি পূর্ণবয়স্ক পোকা থাকলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৪। বাদামি গাছ ফড়িং (Brown plant hopper)

ক্ষতির লক্ষণ

১) বাদামি গাছ ফড়িং ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়।
২) আক্রান্ত গাছ প্রথমে হলদে এবং পরে পুড়ে যাওয়ার মত রং ধারন করে মারা যায়। একে হপার বার্ণ বলে।

দমন ব্যবস্থা

১) আলোক ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক পোকা দমন করা ।
২) অধিক দূরত্বে চারা রোপন করা (২৫×২৫ সে.মি)।
৩) আগাম পাকে এমন জাতের ধান চাষ করা।
৪) অধিক আক্রমন হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা।

৫। সবুজ পাতা ফড়িং (Green leaf hopper)

ক্ষতির লক্ষণ

১) পূণবয়স্ক ও বাচ্চা উভয় অবস্থায় এ পোকা ধানের পাতার রস শুষে খায়।
২) গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও গাছ খাটো হয়।
৩) এ পোকা টুংরো ভাইরাস ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থা

১) আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পোকা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
২) হাতজাল ব্যবহার করে পোকা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
৩) প্রতিরোধী জাত যেমন বিআর-১, বিআর-২, বিআর-৫, বিআর-৬, বিআর-১০, বিআর-১২ জাতের ধান চাষ করা।

৬। গান্ধি পোকা (Rice bug)

ক্ষতির লক্ষণ

১) ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমন করে।
২) পূর্ণবয়স্ক ও বাচ্চা পোকা উভয়ই ধানের দানায় খোসা ছিদ্র করে ধানের দুধ শুষে খায়।
৩) ধান চিটা হয় এবং চিটার গায়ে বাদামি গোলাকার দাগ দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

১) আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা।
২) হাতজাল ব্যবহার করা।
৩) পাখি বসার জন্য ডালপালা পুঁতে দেয়া।
৪) ধানের প্রতি গোছায় ২-৩ টি গান্ধী পোকা দেখা গেলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা।

৭। পাতা মোড়ানো পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

১) পাতা মোড়ানো পোকার কীড়া ধানের পাতা লম্বালম্বি মুড়িয়ে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতায় লম্বা সাদা দাগ করে।
২) পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়।

দমন ব্যবস্থা

১) আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।
২) ডালপালা পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা।
৩) ২৫% পাতার ক্ষতি হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা।

৮। চুঙ্গি পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

১) চুঙ্গি পোকা পাতার উপরের অংশ কেটে ছোট ছোট চুঙ্গি তৈরি করে ভেতরে থাকে।
২) গাছের পাতা সাদা হয়ে যায় ও পাতার উপরের অংশ কাটা থাকে।
৩) দিনের বেলায় চুঙ্গিগুলো পানিতে ভাসতে থাকে।

দমন ব্যবস্থা

১) আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে মথ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
২) হাতজাল ব্যবহার করে চুঙ্গিসহ কীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
৩) আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে ফেলতে হবে এবং জমি শুকিয়ে ফেলতে হবে।
৪) বেশি আক্রমন হলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ধানের রোগ বালাই

বাংলাদেশে ধানের ৩২টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। রোগগুলি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও কৃমি দ্বারা সংঘটিত হয়। এখানে ধানের কয়েকটি প্রধান রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা বর্ণনা করা হলো:

১। পাতা পোড়া বা পাতা ঝলসানো রোগ

কারণ : ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমনে হয়।

লক্ষণ

১) চারা অবস্থায় এ রোগ হলে আক্রান্ত গাছের গোড়া পত্রফলক, বাইরের পাতা হলদে হয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়।
২) বয়স্ক গাছে থোড় অবস্থা থেকে পাতা পোড়া রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

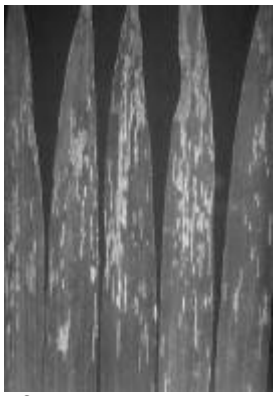

চিত্র ৭.২.৩ : পাতা ঝলসানো রোগ

দমন ব্যবস্থা

১) রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা। যেমন- বিআর-২, বিআর-৪, ব্রিধান-২৭, ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-২৯, ব্রিধান-৩১ ইত্যাদি।

২) আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা।
৩) সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা।
৪) আক্রান্ত জমির পানি শুকিয়ে আবার সেচ দেয়া।
৫) ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলা।

২। খোলপোড়া রোগ

কারন: ছত্রাক সংক্রমনে হয়

লক্ষণ

১) ধান গাছের কুশি গজানোর সময় রোগটির প্রাদুর্ভাব হয়।
২) প্রথমে খোলে ধুসর দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে সমস্ত খোলে ও পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।
৩) পত্রফলকে গোখরা সাপের চামড়ার ন্যায় দাগ তৈরি হয়।

দমন ব্যবস্থা

১) সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।
২) নির্দিষ্ট দূরত্বে সারি করে ধান লাগাতে হবে।
৩) বেশি আক্রান্ত হলে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।
৪) ফসল কাটার পর আক্রান্ত জমির নাড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩। কান্ড পচা রোগ

কারন: ছত্রাক সংক্রমনে হয়।

লক্ষণ

১) খোলে কালচে গাঢ় অনিয়মিত দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে বড় হয়।
২) কান্ড চিড়লে কালো গোলাকার বুটির মত দানা দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

১) রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন- বিআর-১১, বিআর-১৪, ব্রিধান-১৭, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩১, ব্রিধান-৪০, ব্রিধান-৪২ ইত্যাদির চাষ করা।
২) সুষম সার ব্যবহার করা।

৪। খোলপচা রোগ

কারন: ছত্রাক সংক্রমনে হয়।

লক্ষণ

১) ডিগপাতার খোলে গোলাকার বা অনিয়মিত দাগ পড়ে। দাগগুলির কেন্দ্র ধূসর ও কিনারা বাদামী হয়। দাগগুলো মিশে বড় হয়।
২) শীষ আংশিক বের হয়।
৩) খোল পচে যায়।

দমন ব্যবস্থা

১) সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা।
২) রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা ও বীজ শোধন করা।
৩) ধান কাটার পড় খড়কুটো জমিতে পুড়িয়ে ফেলা।

৫। টুংরো রোগ

কারন: ভাইরাস সংক্রমনে হয়।

লক্ষণ

১) পাতার রং হালকা সবুজ হয় এবং পরে হলদে হয়।
২) গাছ টান দিলে উঠে আসে।
৩) আক্রান্ত পাতা মুচড়ে যায় ও গাছ খাটো হয়।

দমন ব্যবস্থা

১) সবুজ পাতা ফড়িং ভাইরাস ছড়ায়। তাই এ পোকা দমন করা জরুরী।
২) রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা।
৩) রোগাক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলা।
৪) সবুজ পাতা ফড়িং দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৬। ব্লাস্ট রোগ

কারন: ছত্রাক সংক্রমনে হয়।

লক্ষণ

১) পাতায় ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে।
২) দাগের চারিদিকে গাঢ় বাদামী এবং মাঝের অংশ সাদা ছাই বর্ণের হয়।
৩) কান্ডের গিঁটে, খোল ও পাতার সংযোগস্থান কালো দাগ সৃষ্টি করে।
৪) শিষের গোড়ায় কালো দাগের সৃষ্টি করে এবং গোড়া পচে যায় এতে চিটা ও অপুষ্ট দানা হয়।

দমন ব্যবস্থা

১) জমিতে সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করতে হবে।
২) রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন- বিআর-৩, বিআর-১৪, বিআর-১৫, বিআর-১৬, বিআর-২৪ ইত্যাদি চাষ করা।
৩) রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা ও বীজ শোধন করা।
৪) পটাশ জাতীয় সার উপরি প্রয়োগ করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা ধানের পোকামাকড় ও রোগবালাই এর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং এদের লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা সরোজমিনে পরিদর্শন করবে।

সারাংশ

ধানের ক্ষতিকর পোকামাকড় হল মাজরা পোকা, গলমাছি পোকা, পামরি পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গি পোকা। রোগ বালাইগুলি হল পাতা ঝলসানো, খোলপোড়া, কান্ড পঁচা, খোল পচা, টুংরো রোগ, ব্লাস্ট রোগ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ধানের মাজরা পোকা আক্রমণের লক্ষণ কি?
   ক) আক্রান্ত কুঁশি পিঁয়াজের মতরং
   খ) শীষ আসার সময় হলে 'হোয়াইট হেড' বের হয়
   গ) পাতা শুকিয়ে পুড়ে যাওয়ার মত হয়
   ঘ) গাছ খাটো হয়

২। ধানের টুংরো ভাইরাস ছড়ায় কোন পোকা
   ক) পামরি পোকা খ) সবুজ পাতা ফড়িং
   গ) মাজরা পোকা ঘ) গলমাছি

৩। পাতা ঝলসানো রোগ কি দ্বারা সংক্রমণ হয়?
   ক) ব্যাকটেরিয়া খ) ছত্রাক
   গ) ভাইরাস ঘ) নেমাটোড

পাঠ-৭.৩ ডাল ফসল : মসুর ও মুগডাল চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মসুর ও মুগ চাষে কাঙ্খিত জলবায়ু সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মসুর ও মুগ চাষে জমি নির্বাচন করতে পারবেন;
- মসুর ও মুগের জাতের নাম বলতে পারবেন;
- মসুর ও মুগ চাষে সার প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- মসুর ও মুগের বপন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- মসুর ও মুগের আন্ত:পরিচর্যা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মসুর ও মুগ ফসলের কর্তন, শুকানো ও মাড়াই সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মসুর ও মুগ ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ডাল জাতীয় ফসল, লিগুমিনোসী, লিগিউম জাতীয় ফসল, শুটি, নডিউল।

ডাল ফসলের পরিচিতি ও গুরুত্ব

যে সমস্ত মাঠ ফসল খেলে আমিষজাতীয় খাবারের ঘাটতি পূরণ হয় তাদেরকে ডালজাতীয় ফসল (Pulse crops) বলা হয়। ডাল লিগুমিনোসী (Leguminosae) পরিবারের ফসল বিধায় এদেরকে লিগিউমজাতীয় ফসল বলা হয়। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই ডাল ফসল চাষ করা যায়, তবে বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিই এদের জন্য সবচেয়ে উত্তম। সহজাতভাবে ডাল ফসল কম ফলনশীল এবং পর্যাপ্ত পরিচর্যায়ও তেমন সাড়া দেয় না। তাই দিন দিন এদেশে ডাল ফসলের চাষ কমে যাচ্ছে এবং ডালের চাহিদা মেটানোর জন্য তা আমদানি করতে হচ্ছে। এদেশে মোট উৎপাদিত ডাল ফসলের শতকরা ৮৩ ভাগই শীতকালীন ফসল, তবে মাসকালাই ও মুগডাল গ্রীস্মকালে চাষ হয়। প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন গড়ে কত কিলোক্যালরী শক্তি প্রয়োজন বিভিন্ন খাবারের সাথে আমিষও তা যোগায়। এই আমিষ সাধারণত দুটি উৎস থেকে মানুষ গ্রহণ করে – একটি উদ্ভিদজাত এবং অন্যটি প্রাণীজ। প্রাণীজ আমিষ হলো মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি। এই প্রাণীজ আমিষের দাম বেশি বলে এদেশের সাধারণ গরীব মানুষ তুলনামূলকভাবে সস্তায় ডাল ক্রয় করতে পারে এবং তা খেতেও তারা স্বাচ্ছন্দবোধ করে। তাই সাধারণ মানুষ আমিষ খাবারের ঘাটতি ডাল ফসল থেকেই পূরণ করে বলে ডালকে গরীবের মাংস বলা হয়। কোনো জমিতে ডাল ফসল চাষ করলে সেই জমিতে জৈব সার ও নাইট্রোজেন যোগ হয়ে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর ডাল ফসল হাজার হাজার টন বায়বীয় নাইট্রোজেন জমিতে যোগ করে যা অন্যান্য ফসলের ভালো ফলন পেতে সাহায্য করে। এতে কৃষকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হোন। ধান, গম বা আখের সঙ্গে ডালকে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। এ ফসল চাষে উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম এবং এতে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের উপদ্রব কম হয়। ডালের উপজাত (যেমন-ভূষি) খুব ভালো পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে করে কম খরচে এদেশের গবাদিপশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ডালফসল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে চাষ হয় এমন কয়েকটি ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের বাংলা, ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখ করা হলো –

ডালজাতীয় ফসল

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
মসুর	Lentil	*Lens culinaris*
মুগ	Green gram/Golden gram	*Vigna radiata*
মাসকালাই	Black gram	*Vigna mungo*

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
খেসারী	Grass pea	*Lathyrus sativus*
অড়হর	Pigeon pea/Red gram	*Cajanus cajan*
মটর	Field pea/Garden pea	*Pisum sativum*
ছোলা	Gram/Chick pea	*Cicer arietinum*
শিম	Country bean	*Dolichos lablab*
গোসীম	Cow pea/China pea	*Vigna unguiculata*
বরবটি	Yard long bean	*Vigna sinensis*

মসুর ডাল চাষ পদ্ধতি

মসুরের ইংরেজি নাম Lentil এবং *Lens culinaris* হলো বৈজ্ঞানিক নাম। এর চাষ পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো –

চিত্র ৭.৩.১ : মসুর ডাল

জলবায়ু

বাংলাদেশে শীতকালে মসুরের চাষ হয়ে থাকে। মসুর সাধারণত: কম তাপমাত্রা (১৫-২৮$^{\circ}$ সে.) এবং শুষ্ক জলবায়ু পছন্দ করে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৫-৮৫% এবং উজ্জ্বল সূর্যালোক প্রয়োজন হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ মিটার উঁচুতেও এ ফসল চাষ করা যায়। এ ফসল খরা সহিষ্ণু এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না।

মাটি বা জমি নির্বাচন

সব ধরনের মাটিতেই মসুর চাষ করা যায়। তবে সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটি মসুর চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। মাটির পিএইচ বা অম্লমান ৬.৫-৭.৫ হলে ভালো হয়। চাষ করার পর জমিতে জলাবদ্ধতা তৈরি হলে মসুর ভালো হয় না। তাই উঁচু জমি নির্বাচন করা উত্তম।

জাত

বাংলাদেশে চাষকৃত মসুর ডালের মধ্যে বিনা মসুর ১, বিনা মসুর ২, বিনা মসুর ৩, বিনা মসুর ৪, বিনা মসুর ৫, বিনা মসুর ৬, বারি মসুর ১, বারি মসুর ২, বারি মসুর ৩, বারি মসুর ৪, বারি মসুর ৫, বারি মসুর ৬, বারি মসুর ৭, মুকদিয়া ১৫ ও জামালপুর ২ জাত উল্লেখযোগ্য। এদের জীবনকাল ৯৫-১৩৫ দিন। এরা তুলনামূলকভাবে উচ্চ ফলনশীল, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধী ও বেশি আমিষ সমৃদ্ধ এবং এদের বীজ আকার বড় হয়।

বপন সময়

মধ্য আক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ধরা হয়। এর কিছুটা আগে বা পরে বীজ বপন করলে কাঙ্খিত ফলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

জমি তৈরি

মসুর বীজ আকারে ছোট হওয়ায় সাধারণত: ৩-৪ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও সমতল করে জমি তৈরি করতে হয়। জমি তৈরির সময় আগাছা ও বিভিন্ন আবর্জনা পরিস্কার করতে হয় এবং সম্ভব হলে তা পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে জমিতে জৈব সার যোগ হয়। এ ফসল জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জমি তৈরির সময় এমনভাবে নালা কেটে রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির সময় পানি সহজেই জমি থেকে বের হয়ে যেতে পারে।

সার প্রয়োগ

মসুর চাষে হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৮৫ কেজি টিএসপি বা ডিএপি এবং ৩৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হয়। জমি তৈরির শেষ চাষের সময় ইউরিয়া ছাড়া সব সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার তিনভাগ

করে প্রথম ভাগ চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর, দ্বিতীয় ভাগ ৩০-৪০ দিন পর এবং ৩য় ভাগ ৫০-৬০ দিন পর ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। তবে পচা গোবর, কম্পোস্ট, খামারজাত সার ও জীবাণু সার এদের যে কোন একটি প্রয়োগ করলে ইউরিয়া সার লাগবে না। জীবানু সার প্রয়োগের পূর্বে এক কেজি মসুর বীজের সাথে ৫০ গ্রাম জীবাণু সার ও ৫০ গ্রাম চিটাগুড় মিশাতে হয়।

বীজ হার

ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টর প্রতি ৩৫-৪০ কেজি এবং সারিতে বপন করলে ৩০-৩৫ কেজি বীজ লাগে। তবে বিলম্বে বপন করলে বীজহার ৫-১০ কেজি বেশি লাগতে পারে।

বীজ শোধন

প্রতি কেজি শুকনো মসুর বীজ ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ এর সাথে বা অন্য কোন বীজ শোধকের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হয়। এতে করে মসুর ফসল বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পায়।

বপন পদ্ধতি

ছিটিয়ে বা সারি উভয় পদ্ধতিতে মসুর বীজ বপন করা যায়। সারিতে বীজ বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ১০ সে.মি. দেয়া যেতে পারে। সাধারণত: মসুর বীজ ১.৫-২.৫ সে.মি. গভীরে বপন করতে হয়। তবে বপনের এই গভীরতা মাটিতে বিদ্যমান রসের ওপর নির্ভর করে।

আন্তঃপরিচর্যা

ক) আগাছা দমন : মসুরের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের আগাছা যেমন- বথুয়া, চাপড়া, দূর্বা, মুথা ইত্যাদি জন্মায়। এ সমস্ত আগাছা চারা গজানোর ২০-৩০ দিন পর নিড়ানী দিয়ে দমন করতে হয়।

খ) সেচ ও নিকাশ : এ ফসল খরা সহিষ্ণু বিধায় খুব একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া মসুর গাছ গভীরমূলী হওয়ায় মাটির নীচ থেকে পানি টেনে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। বীজ বপনের সময় মাটিতে রস না থাকলে বপনের পর হালকা সেচ দিলে চারা গজাতে সহজ হয়। এছাড়াও মসুর ফসলের বৃদ্ধির সময় হালকা সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। অতিরিক্ত বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়।

গ) পোকা দমন : মসুর ফসলে জাব পোকা, ফলছেদক পোকা, শুসরী পোকা, থ্রিপস, পাতার উইভিল, সবুজ গান্ধী পোকা ও কাটুই পোকার আক্রমণ হয়। এগুলোর মধ্যে জাব পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। পূর্ণ বয়স্ক জাবপোকা মসুরের কচি পাতা, কান্ড, পুষ্পমঞ্জরী ও শুটি থেকে রস শুষে খায়। ফলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় ও বৃদ্ধি কম হয়। পড বা শুঁটি বের হয় না। বের হলেও সুস্থ ও সবল বীজ পাওয়া যায় না। ডিটারজেন্ট পাউডার পানির সাথে মিশিয়ে হলুদ পাত্র দিয়ে ফাঁদ তৈরি করে বা অনুমোদিত কোনো কীটনাশক স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

ঘ) রোগ দমন : অনেক রোগ আছে যেগুলো মসুর গাছের ক্ষতি করে থাকে। যেমন- মুল ও গোড়া পচা রোগ, মরিচা রোগ, ঢলে পড়া রোগ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে মুল ও গোড়া পচা রোগ উল্লেখযোগ্য। এ রোগে কম বয়সেই চারা হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে মারা যায়। নেতিয়ে পড়া চারা শুকিয়ে খড়ের মতো আকার ধারণ করে । অনেক সময় চারার গোড়ায় সূতার মতো মাইসেলিয়াম দেখা যায়। মুল আক্রান্ত হলে গাছ ছোট হয় এবং ঢলে পড়ে মারা যায়। এ রোগে আক্রান্ত গাছ জমিতে দেখা গেলে তা তুলে পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম।

ফসল কর্তন, শুকানো ও মাড়াই

মসুর গাছের পড বা শুটি কালো এবং দানা বাদামি রং ধারণ করলে পরিপক্ক হয়েছে ধরে নিতে হয়। শতকরা ৮০ ভাগ পড বা ফল পরিপক্ক হলে জমি থেকে ফসল সংগ্রহ করতে হয়। বেশি পরিপক্ক বা শুকালে দানা ঝরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হাত দিয়ে টেনে গাছ তুলতে হয়। এরপর পরিস্কার স্থানে পলিথিন শীট বিছিয়ে বা পাকা মেঝেতে গাছ ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করে গাছ থেকে দানা আলাদা করা হয় এবং কুলার সাহায্যে পরিস্কার করতে হয়। বীজকে রোদে এমনভাবে শুকাতে হয় যেন বীজে আর্দ্রতা ৮-১০% এর বশি না থাকে।

ফলন : ১.৮-২.২ টন/হেক্টর।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মসুর অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার ও প্রিয় ডাল হিসেবে পরিচিত। এই ডালে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ (প্রায়)। এই ডালের খোসা ও শুকনো গাছ গবাদি পশুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের মোট আবাদি জমির শতকরা ০.০৬ ভাগ জমিতে এ ডাল চাষ হয়। বাংলাদেশে মসুর মোট ডালের শতকরা প্রায় ২৬-২৮ ভাগ সরবরাহ করে। আবাদকৃত মোট জমি ও উৎপাদনের দিক থেকে এ ডাল দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কম বেশি মসুর ডালের চাষ হয়। তবে রাজশাহী, যশোর, পাবনা ও ফরিদপুর জেলা মসুর চাষে এগিয়ে রয়েছে।

মুগ ডাল চাষ

মুগের ইংরেজি নাম Greengram এবং *Vigna radiata* এর বৈজ্ঞানিক নাম। এর চাষ পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো –

চিত্র ৭.৩.২ : মুগ ডাল

জলবায়ু

মুগ চাষের জন্য কাঙ্খিত তাপমাত্রা হলো ২৫-৩০° সে.। সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ২০-২২° সেলসিয়াসেও চাষ সম্ভব। তবে ২০° সে. এর নিচে তাপমাত্রা হলে এ ফসলের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। আশানুরূপ ফলনের জন্য গড় তাপমাত্রা ২৮-৩১° সে. হলে ভালো হয়। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ, হালকা বৃষ্টিপাত ও উজ্জ্বল সূর্যালোক মুগ চাষের জন্য উপযোগী।

মাটি বা জমি নির্বাচন

সুনিষ্কাশিত সব ধরনের মাটিতেই মুগ চাষ করা যায়। তবে দোআঁশ মাটি উত্তম। উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমি চাষের জন্য উপযোগী। মাটির পিএইচ বা অম্লমান ৬-৭ হলে ভালো হয়।

জাত

মুগের বিভিন্ন জাত রয়েছে। যেমন- বারিমুগ ১, বারিমুগ ২, বারিমুগ ৩, বারিমুগ ৪, বারিমুগ ৫, বারিমুগ ৬, বিনামুগ ১, বিনামুগ ২, বিনামুগ ৩, বিনামুগ ৪, বিনামুগ ৫, বিনামুগ ৬, বিনামুগ ৭ ও বিনামুগ ৮। এ সমস্ত জাতগুলো বিভিন্ন রোগ সহনশীল। এরা উচ্চ ফলনশীল জাত। এদের বীজ ও পডের আকার বড় হয়। অধিকাংশ জাতই সারা বছরব্যাপী চাষ করা যায়।

বপন সময়

মুগ ডাল সারা বছর অর্থাৎ রবি, খরিফ ১ ও খরিফ ২ এই তিন মৌসুমেই চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে পৌষ-মাঘ মাসে, খরিফ ১ মৌসুমে ফাল্গুন মাসে ও খরিফ ২ মৌসুমে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মুগ আবাদ করা যায়। তবে রবি মৌসুম উত্তম। কারণ এই মৌসুমে বেশি ফলন পাওয়া যায়। খরিফ ২ মৌসুমের চেয়ে খরিফ ১ মৌসুমে ফলন বেশি হয়।

জমি তৈরি

৩-৪ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে সমান করে নিতে হয়। আগাছা ও ময়লা-আবর্জনা থাকলে পরিস্কার করে তা একসাথে পুড়িয়ে দিলে জমিতে জৈব সার যোগ হয়। মাটির উপরের স্তরে পর্যাপ্ত রস থাকলে বিনা চাষেও বা ২-১ টি চাষ দিয়েও মুগ আবাদ করা সম্ভব।

সার প্রয়োগ

প্রতি হেক্টর মুগ জমিতে ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ১০০ কেজি টিএসপি ও ৫৮ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমি তৈরির সময় শেষ চাষের সাথে ছিটিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার তিনভাগ করে ১ম ভাগ চারা গজানোর ১৫ দিন পর, ২য় ভাগ ৩০ দিন পর এবং ৩য় ভাগ ৪০ দিন পর ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বায়ু থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন সংযোজন করে মুগ গাছের শিকড়ে গুটি (nodule) তৈরি করে বিধায় মুগ ফসলে ইউরিয়া সার কম প্রয়োগ করলেও চলে।

বীজহার

বীজের আকার ও বপন পদ্ধতি অনুযায়ী বীজের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ কেজি এবং সারিতে বপন করলে ৩০-৩৫ কেজি বীজ লাগে।

বীজ শোধন

অনেক রোগ আছে যা বীজবাহিত। এই বীজবাহিত রোগ জীবাণুকে মুক্ত করার জন্যই বীজ শোধন করতে হয়। এক কেজি মুগ বীজের সাথে ৩ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা অন্য কোন বীজশোধক অনুমোদিত মাত্রায় বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করা হয়।

বপন পদ্ধতি

ছিটিয়ে বা সারিতে উভয় পদ্ধতিতে মুগ বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব রবি মৌসুমে ৩০ সে.মি. ও খরিফ মৌসুমে ৪৫ সে.মি. এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৮-১০ সে.মি. দিতে হয়। সারিতে বপন করলে বীজের পরিমাণ কম লাগবে এবং ফলন বেশি হবে। এছাড়াও আগাছা দমনসহ বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। ৩-৫ সে.মি. মাটির নিচে বীজ বপন করতে হয়।

আন্তঃপরিচর্যা

ক) আগাছা দমন : মুগ জমিতে মুথা, বথুয়া, চাপড়া, দূর্বা ইত্যাদি আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। মুগের চারা গজানোর পর এ আগাছাগুলো নিড়ানী দিয়ে ২-৩ বার পরিষ্কার করা উচিত। এতে মুগের ফলন বেশি হয়।

খ) সেচ ও নিকাশ : মুগ চাষের জমিতে রস কম থাকলে বপনের সময় বীজের অঙ্কুরোদগম নিশ্চিত করার জন্য হালকা সেচ দিতে হয়। এছাড়াও গাছের দৈহিক বৃদ্ধির সময় সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। মুগ কিছুটা খরা সহিষ্ণু ফসল। কারণ গভীরমূলী হওয়ায় মাটির নিচ থেকে পানি শোষণ করে নিতে পারে। বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে জমিতে জলাবদ্ধতা তৈরি হলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। জলাবদ্ধতা ও অতিরিক্ত খরা উভয়ই মুগের জন্য ক্ষতিকর।

গ) পোকা দমন : মুগ ফসলে বিছাপোকা, ফলছেদক পোকা ও জাব পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। বিছাপোকা কচি ডগা খায় ও পাতা খেয়ে জালের মত করে ফেলে। ফলছেদক পোকা কচি ও পরিপক্ক ফল ছিদ্র করে খায়। জাবপোকা গাছের কচি অংশ থেকে রস শোষণ করে খায়। এতে করে মুগের ফলন কম হয়। বিছাপোকা দলবদ্ধভাবে পাতায় থাকে বিধায় আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে এ পোকা মেরে ফেলা উচিত। এছাড়া অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করে বর্ণিত পোকাগুলো দমন করা যায়।

ঘ) রোগ দমন : অনেক রোগ দেখা যায়। এর মধ্যে হলুদ মোজাইক, পাতার দাগ রোগ ও পাউডারি মিলডিউ রোগ গুরুত্বপূর্ণ। হলুদ মোজাইক রোগে পাতার উপর গাঢ় সবুজ ও হলুদ রংয়ের মিশ্রণ দেখা যায়। ফুল ও ফল কুঁকড়ে যায়, বীজ অপুষ্ট কুকড়ানো হয় এবং গাছ খাটো হয়। পাতার দাগ রোগে পাতার উপর পানিভেজা ছোট ছোট দাগ পড়ে, দাগগুলো বাদামি বা লালচে বাদামি হয়ে আস্তে আস্তে বড় হয় এবং পাতা ঝড়ে পড়ে। পাউডারি মিলডিউ রোগে পাতার উপর সাদা পাউডারের মত ছোট ছোট দাগ পড়ে এবং পরে এই দাগগুলো কালো বা গাঢ় বাদামি রংয়ের দাগে পরিণত হয়। হলুদ মোজাইক রোগ ভাইরাস দ্বারা এবং পাতার দাগ ও পাউডারি মিলডিউ রোগ ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধী জাত, বীজশোধক ও অনুমোদিত রোগনাশক ব্যবহার করে এ সমস্ত রোগের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ফসল কর্তন, শুকানো ও মাড়াই

শুটি (pod) কালো বর্ণ ধারণ করলে ও নিচের পাতা হলুদাভ হলে মুগ পরিপক্ক হয়েছে বুঝতে হবে। এছাড়া শতকরা ৮০ ভাগ দানার বর্ণ বাদামি হলেও বুঝতে হবে মুগ পরিপক্ক হয়েছে। বেশি পরিপক্ক হলে বা শুকালে দানা ঝরে পড়ে। তাই কাঙ্খিত সময়ে গাছ জমি থেকে হাত দিয়ে টেনে তুলতে হয়। এরপর মাটির উপর পলিথিন শীট বা পাকা মেঝেতে গাছগুলো শুকিয়ে নিয়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করে দানাগুলো আলাদা করা হয়। এরপর কুলা দিয়ে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। সংরক্ষণের পূর্বে দানাগুলো রোদে এমনভাবে শুকাতে হয় যাতে দানাতে ৮-১০% এর বেশি আর্দ্রতা না থাকে।

ফলনঃ ০.৯-২.০ টন/হেক্টর।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মুগ ডাল খেতে মজা হওয়ায় এটা খুবই জনপ্রিয়। এমনকি দেশের কোন কোন অঞ্চলে এ ডালকে 'জামাই ডাল' বলা হয়। সারাদেশেই এ ডালের সামাজিক কদর রয়েছে। অন্যান্য ডালের চেয়ে এ ডালের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বাংলাদেশে এ ডালের আওতাধীন জমির পরিমাণ কম হলেও বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে এর আবাদ বেশি হয়ে থাকে।

সবুজ অবস্থায় মুগ ফসল পশুখাদ্য ও সবুজ সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ ডালে ২৫% আমিষ, ৬২.৬% শর্করা, ১.১৫% স্নেহ, প্রচুর পরিমাণে রিবোফ্লোবিন ও থায়ামিন রয়েছে। অঙ্কুরিত মুগডাল ভিটামিন সি এর কার্যকরী উৎস।

শিক্ষার্থীর কাজ	উদাহরণসহ ডাল এর গুরুত্বে ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন। মসুর ও মুগ ডালের চাষ পদ্ধতির উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারাংশ

যে সমস্ত মাঠ ফসল খেলে আমিষজাতীয় খাবারের অভাব দূর হয়, তাদেরকে ডালজাতীয় ফসল বলা হয়। যেমন-মসুর, মুগ, মাষকালাই, খেসারী, ছোলা, মটর ইত্যাদি। এরা লিগুমিনোসী পরিবারের ফসল বিধায় এদেরকে লিগিউমজাতীয় ফসল বলা হয়। রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এজাতীয় ফসলের মুলে নডিউল সৃষ্টি করে। এতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মসুর ও মুগের ইংরেজি নাম যথাক্রমে Lentil ও Greengram এবং বৈজ্ঞানিক নাম যথাক্রমে *Lens culinaris* *Vigna radiata* মসুর সাধারণত কম তাপমাত্রা ও শুষ্ক জলবায়ু পছন্দ করে। এরা খরা সহিষ্ণু এবং বেশি বৃষ্টিপাত সহ্য করতে পারে না। বাংলাদেশে বিনা মসুর ১ থেকে ৭ বারি মসুর ১ থেকে ৭, মুকদিয়া ও জামালপুর ২ জাত উল্লেখযোগ্য। ফলে হেক্টরপ্রতি ১.৮-২.২ টন হয়ে থাকে। অপরদিকে মুগ ২৫-৩০ সে. তাপমাত্রায় ভালো জন্মায়। হালকা বৃষ্টিপাত ও উজ্জ্বল সূর্যালোকে মুগ চাষের জন্য বেশ ভালো। এদেশে বারিমুগ ১ থেকে ৬, বিনা মুগ ১ থেকে ৮ চাষ হয়ে থাকে। বেশির ভাগ জাতই সারা বছর চাষ করা যায়। ফল প্রতি হেক্টরে ০.৯-২.০ টন হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন্‌টি মসুরের জাত?

ক) মুকদিয়া ১৫ খ) কিরণী

গ) সোহাগ ঘ) ডেভিস

২। জীবাণুসার প্রয়োগ করা হলে কোন্ রাসায়নিক সার না দিলেও চলে?

ক) এমওপি খ) টিএসপি গ) ইউরিয়া ঘ) জিপসাম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও —

জমির মিয়া উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে বিনামুগ ৮ চাষে উদ্বুদ্ধ হন।

৩। বিনামুগ ৮ চাষে জমির মিয়ার উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ —

i) উচ্চ ফলনশীল

ii) সারা বছরব্যাপী চাষ করা যায়

iii) আগাম পাকে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i

৪। বিনামুগ ৮ এর ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?

ক) শুধু বীজের আকার বড়

খ) শুধু পডের আকার বড়

গ) বীজ ও পড উভয়ের আকার বড়

ঘ) পডের আকার বড় কিন্তু বীজ ছোট

পাঠ-৭.৪ তেল ফসল : সূর্যমুখী চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সূর্যমুখীর চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূর্যমুখীর জাতের নাম বলতে পারবেন;
- সূর্যমুখীর বপন সময় ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সূর্যমুখী চাষে আন্তঃপরিচর্যার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সূর্যমুখীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সূর্যমুখী, জাত, চাষ পদ্ধতি, বপন সময়, বপন পদ্ধতি, আন্তঃপরিচর্যা, ফলন, অর্থনৈতিক গুরুত্ব

তেল ফসল ও এর গুরুত্ব

যে সমস্ত মাঠ ফসলের বীজ থেকে ভোজ্য তেল পাওয়া যায় তাদেরকে তেলজাতীয় ফসল (Oil seed crops) বলা হয়। ভোজ্য তেল আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তেল বা চর্বি দেহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কর্মশক্তি সরবরাহ করে। এই তেল ভিটামিন A, D, E এবং K পরিশোষণে সহায়তা করে। প্রাণী থেকে প্রাপ্ত তেল ব্যয়বহুল হওয়ায় উদ্ভিদজাত তেলই বাঞ্ছনীয়। উদ্ভিদজাত তেল সহজ পাচ্য এবং এর পুষ্টিমানও প্রাণীজ তেল থেকে বেশি। তেল বীজ থেকে তেল আহরণ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে খৈল বলা হয়। এই খৈল গবাদি পশু, হাঁস মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রায় সব ধরনের খৈল জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা হয়। কিছু তেল ফসল যেমন- চীনাবাদাম ও সয়াবীন চাষ করলে তাদের মুলের গুটি (Nodule) থেকে জমিতে নাইট্রোজেন সার যোগ হয়। সরিষা, সূর্যমুখী, তিল ও গর্জন তিলের ক্ষেতে মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহ করা যায়। নানা প্রকার তেল বিভিন্ন প্রকার শিল্পজাত সামগ্রী যেমন- মোম, সাবান ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

তেলজাতীয় ফসল

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
সূর্যমুখী	Sunflower	*Helianthus annus*
সয়াবিন	soybean	*Glycine max*
সরিষা	Rapeseed and Mustard	*Brassica campestris* *B. juncea* *B. napus*
তিল	Sesame	*Sesamum indicum*
তিসি	Linseed	*Linum usitatissimum*
চীনাবাদাম	Groundnut	*Arachis hypogaea*
কুমুস ফুল	Safflower	*Carthamus tinctorius*
ভেরেন্ডা	Castor	*Ricinus communis*
গর্জন তিল	Nizer	*Guizotia abyssinica*

সূর্যমুখী চাষ

সূর্যমুখীর ইংরেজি নাম Sunflower এবং *Helianthus annus* হলো এর বৈজ্ঞানিক নাম। এর চাষ পদ্ধতি (Cultivation method) নিম্নে বর্ণনা করা হলো –

জলবায়ু

সূর্যমুখী আলো নিরপেক্ষ ফসল হওয়ায় সারা বছর এর চাষ করা যায়। বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারা গজানোর পর কিছুদিন ঠান্ডা আবহাওয়া উত্তম। চারার দৈহিক বৃদ্ধি ও পুষ্পায়নের জন্য কিছুটা উষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন। এ ফসলে তাপমাত্রার প্রভাব অনেকটা কম। দৈহিক বৃদ্ধির সময় হালকা বৃষ্টিপাত হলে ভালো। তবে ভালো ফলনের জন্য বীজ পাকার সময় মেঘমুক্ত আকাশ খুবই উপযোগী।

মাটি বা জমি নির্বাচন

সূর্যমুখী সাধারণত সব ধরনের মাটিতেই জন্মানো যায়। তবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম। বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে থাকে না এমন জমি সূর্যমুখী চাষের জন্য ভালো। উঁচু থেকে মাঝারি নিচু জমিতে এ ফসল চাষ করা যায়। মাটিতে আর্দ্রতা বা রসের পরিমাণ বেশি হলে বীজ বুনার পর তা পচে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

জাত

কিরণী (ডিএস ১), বারি সূর্যমুখী ২ ইত্যাদি। কিরণী জাতটি অন্যান্য জাতের চেয়ে খাটো হয়। তাই ঝড় বা বৃষ্টিতে সহজে হেলে পড়ে না।

বপন সময়

সব মৌসুমেই সূর্যমুখী চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে অগ্রহায়ন মাসে (মধ্য নভেম্বর-মধ্য ডিসেম্বর), খরিফ ১ মৌসুমে বৈশাখ মাসে (মধ্য এপ্রিল-মধ্য মে) এবং খরিফ ২ মৌসুমে ভাদ্র মাসে (মধ্য আগস্ট- মধ্য সেপ্টেম্বর) বীজ বপন করা হয়।

জমি তৈরি

সূর্যমুখী গভীরমূলী ফসল। তাই জমি ভালভাবে চাষ করতে হয়। জমি সাধরণত ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও উপরিভাগ সমান করতে হয়। চাষকৃত জমি ছোট ছোট প্লটে ভাগ করলে পরবর্তী সময়ে আন্তঃপরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

সার প্রয়োগ

সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে সূর্যমূখীর ফলন ভালো হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে ১৮০-২০০ কেজি ইউরিয়া, ১৬০-১৮কেজি টিএসপি, ১২০-১৫০ কেজি এমওপি, ১২০-১৫০ কেজি জিপসাম, ৮-১০ কেজি জিংক সালফেট, ১০-১২ কেজি বরিক এসিড ও ৮০-১০০ কেজি ম্যানেসিয়াম সালফেট প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ বাকী সব সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া দু'ভাগ করে ১ম ভাগ চারা গাজনোর ২০-২৫ দিন পর এবং ২য় ভাগ ৪০-৪৫ দিন পর বা ফুল আসার আগে প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিবার সেচের পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারলে সারের সঠিক ব্যবহার হয়।

বীজ হার

প্রতি হেক্টরে ৮-১০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজশোধন

মাটি ও বীজবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতি কেজি সূর্যমুখী বীজ শোধনের জন্য ৩ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা কাঙ্খিত মাত্রার অন্য কোন বীজশোধক প্রয়োজন। ঢাকনাযুক্ত বড় একটি প্লাষ্টিকের পাত্রে বীজ নিয়ে মাত্রানুযায়ী বীজশোধক ঔষধ মিশিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে ভালোভাবে ঝেঁকে নিয়ে একদিন রেখে দেবার পর বীজ জমিতে বপন করতে হয়।

বপন পদ্ধতি

সূর্যমুখীর বীজ সারিতে বপন করা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সে.মি. এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৩০ সে.মি. রাখা হয়। জাত স্বল্প মেয়াদি ও খাটো হলে সারির দূরত্ব কম রাখা যেতে পারে। প্রতিটি স্থানে ২-৩ টি করে বীজ বপন করা হয়। গজানোর পর একটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হয়। বীজ বপন ও শোধনের পূর্বে ৪-৫ ঘন্টা

পানিতে ভিজিয়ে বীজত্বক নরম করে নিলে অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। বীজ ২-৩ সে.মি. গভীরতায় বপন করতে হয়।

আন্তঃপরিচর্যা

আগাছা দমন, পাতলাকরণ ও শুন্যস্থানপূরণ : সূর্যমুখী জমিতে বথুয়া, দূর্বা, চাপড়া, থানকুনি ইত্যাদি জন্মে। চারা গজানোর পর ৬০ দিন পর্যন্ত জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করার সময় প্রতিটি স্থানে বা গোছায় একটি স্বাস্থ্যবান চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলতে হয়। এছাড়াও কোন স্থানে বা গোছায় চারা না গজালে বা কোন সুস্থ চারা না থাকলে সেই স্থানে তুলে ফেলা চারাগুলোর মধ্য থেকে সুস্থ চারা নিয়ে তা রোপন করে শুন্যস্থান পূরণ করতে হয়। শুন্যস্থান পূরণের কাজটি বিকেল বেলা করা উত্তম। লাগানো চারার গোড়ায় ৩-৪ দিন পানি দিলে চারাটি ভালোভাবে বেড়ে উঠবে।

সেচ ও নিকাশ : খরিফ মৌসুমে সূর্যমুখী ফসলে সাধারণত কোন সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে রবি মৌসুমে ২-৩ বার সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। ১ম সেচ চারা গজানোর ৩০ দিন পর, ২য় সেচ ৫০ দিন পর ও ৩য় সেচ ৭০ দিন পর দিতে হয়। কোন কারণে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পোকা দমন: সূর্যমুখী ফসলে পোকার আক্রমণ খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। তবে মাঝে মধ্যে বিছাপোকার আক্রমণ দেখা যায়। প্রথম দিকে ডিম থেকে শুককীট বের হওয়ার পর এরা একসঙ্গে পাতার নিচের দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে ও পাতা খেয়ে জালের মত ঝাঝড়া করে ফেলে। এতে সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটায় গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কম হয়। পরবর্তীতে শুককীটগুলো বড় হয়ে সারা জমিতে বিস্তারলাভ করে। এ সময় এদেরকে দমন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য প্রথম দিকেই শুককীটগুলো দমন করতে হয়। একটি বালতিতে কিছু পানি ও কেরোসিন বা ডিজেল মিশিয়ে আক্রান্ত পাতা বোঁটাসহ ছিড়ে বালতিতে চুবিয়ে নিলে সব শুককীট মারা যাবে। এছাড়াও অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ দমন : এ ফসলে রোগের আক্রমণ কম হয়। তবে অনেক সময় পাতায় দাগ পড়া, গোড়া পচা ও ঢলে পড়া রোগ দেখা যায়। এ রোগগুলো ছত্রাকের আক্রমণে হয়। ছত্রাকের আক্রমণ বেশি হলে পাতায় দাগ পড়া রোগে গাছের পাতা সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায় এবং ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। চারা গাছে গোড়া পচা রোগ হয় এবং আক্রান্ত চারা গাছের গোড়ায় তুলার ন্যায় সাদা আঁশ ও সরিষার মত বাদামি দানা দেখা যায়। বেশি আক্রান্ত হলে গাছ মরে যায়। পূর্ণবয়স্ক সূর্যমুখী গাছ ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ গাছ মরে যায়। বীজশোধন করে বপন করলে এ সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এছাড়াও অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করেও এ সমস্ত রোগ দমন করা সম্ভব।

গোড়ায় মাটি দেয়া: ইউরিয়া সারের শেষ ভাগ প্রয়োগ করার পর দুই সারির মাঝের মাটি তুলে গাছের গোড়ায় দিতে হয়। এতে গাছের গোড়া মজবুত হয়। ফলে ঝড় বৃষ্টিতে সহজে গাছ হেলে পড়ে না।

পাখি তাড়ানো : সূর্যমুখীর বীজ পুষ্ট হওয়া শুরুর সাথে সাথে টিয়া পাখির উপদ্রব শুরু হয়। খুব সকালে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে পাখির আক্রমণ বেশি হয়। বাঁশের চোঙ বা ঘন্টা বাজিয়ে অথবা জমির মাঝখানে কোরোসিনের টিন উঁচু করে বেঁধে দড়ির সাহায্য দূর থেকে টেনে শব্দ করলে পাখি জমিতে বসতে পারে না।

ফসল কর্তন, শুকানো ও মাড়াই

পরিপক্ক হলে গাছের পাতা হলদে হয়ে আসে এবং পুষ্পস্তবকসহ গাছের মাথা নুয়ে পড়ে। দানাগুলো পুষ্ট, শক্ত ও কালো রং ধারণ করে। কাস্তের সাহায্যে গাছ থেকে পুষ্পস্তবকগুলো কেটে ২/১ দিন রোদে শুকাতে হয়। এরপর লাঠির সাহায্যে আঘাত করে বীজগুলো আলাদা করা হয়। কুলার সাহায্যে বীজগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করার পর রোদে এমনভাবে শুকাতে হয় যাতে দানাতে ৮-১০% এর বেশি আর্দ্রতা না থাকে। বীজ ছাড়ানোর পর পুষ্পস্তবকের অবশিষ্ট অংশ গো-খাদ্য ও গাছগুলো জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ফলন

১.৫-১.৮ টন/হেক্টর।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

সূর্যমুখী ফুল ও তেল উৎপাদনকারী ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। এর তেল এখনও খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়নি। সূর্যমুখীর

তেল সরিষার তেলের চেয়ে অনেক ভালো। কারণ এর তেলে শরীরের জন্য উপকারী লিনোলিক এসিড রয়েছে। এর বীজে ৪৫-৫০% ভোজ্য তেল আছে। খাদ্যমানের দিক থেকে এর তেল বেশ উন্নততর। বিভিন্ন প্রকার রান্নার কাজে এবং ডালডা তৈরিতে সূর্যমুখী তেল ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে এর ব্যাপক চাষ না হলেও নোয়াখালী, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, কুষ্টিয়া, নাটোর, পাবনা ও দিনাজপুর জেলায় কিছু চাষ হচ্ছে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে আমন ধান কাটার পর সূর্যমুখী চাষ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এর ব্যাপক চাষ হয়, যেমন- ভারত, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, আর্জেন্টিনা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সূর্যমুখী চাষ পদ্ধতির ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারাংশ

সূর্যমুখী ইংরেজি নাম Sunflower এবং আলো নিরপেক্ষ ফসল হওয়ায় এটা সারা বছর ধরে চাষ করা যায়। গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে হালকা বৃষ্টিপাত হলে ভালো ফলন হয়। চাষের জন্য দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি অত্যন্ত উপযোগী। কিসো ও বারি সূর্যমুখী ২ জাত উল্লেখযোগ্য। প্রতি হেক্টর জমিতে চাষ ৮-১০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। ফলন ১.৫-১.৮ টন/হেক্টর। এটা তেল ও ফুল উৎপাদনকারী ফসল হিসেবে চাষ হয়ে থাকে। এর বীজে ৪৫-৫০% ভোজ্য তেল থাকে। এর তেল সরিষার তেলের চেয়ে অনেক ভালো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রবি মৌসুমে সূর্যমুখী বীজ বপনের সময় কোনটি?
ক) মধ্য নভেম্বর-মধ্য ডিসেম্বর খ) মধ্য সেপ্টেম্বর-মধ্য অক্টোবর
গ) মধ্য জুলাই-মধ্য আগস্ট ঘ) মধ্য মে-মধ্য জুন

২। সূর্যমুখী জাত কোনটি?
ক) মুকদিয়া ১৫ খ) জামালপুর-২
গ) কিরণী ঘ) রতন

৩। সূর্যমুখীর বীজ পুষ্ট হওয়ার সাথে সাথে-
i) টিয়া পাখির উপদ্রব নয়
ii) জমির মাঝখানে টিন বেঁধে বাজাতে হয়
iii) কাকের উপদ্রব হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সূর্যমুখী
i) আলো নিরপেক্ষ ফসল
ii) তাপমাত্রার প্রভাব অনেকটা কম
iii) অবউষ্ণ আবহওয়ার ফসল
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-৭.৫ তেল ফসল : সয়াবিন চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সয়াবিনের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সয়াবিন চাষে জমি নির্বাচন করতে পারবেন;
- সয়াবিনের জাতের নাম বলতে পারবেন;
- সয়াবিন চাষে সার প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সয়াবিনের বপন সময় ও পদ্ধতির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সয়াবিন চাষে আন্তঃপরিচর্যার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- সয়াবিনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সয়াবিন, জাত, চাষ পদ্ধতি, বপন সময়, বপন পদ্ধতি, আন্তঃপরিচর্যা, ফলন, অর্থনৈতিক গুরুত্ব

সয়াবিনের ইংরেজি নাম Soybean এবং *Glycine max* হলো এর বৈজ্ঞানিক নাম। এর চাষ পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো –

জলবায়ু

সয়াবিন অবউষ্ণ আবহাওয়ায় জন্মাতে পছন্দ করে। এ ফসল খুব বেশি বা খুব কম তাপমাত্রার কোনটিই সহ্য করতে পারে না। উজ্জ্বল সূর্যালোক ও ছোট দিনে পুস্পায়ন হয়। ১৪-১৬ ঘন্টা অন্ধকার পেলে এ ফসলে দ্রুত পুস্পায়ন হয়। দীর্ঘ দিনের অবস্থায় রাখলে ফুল উৎপাদিত হয়ই না।

মাটি বা জমি নির্বাচন

প্রায় সব ধরনের মাটিতেই সয়াবিন চাষ করা যায়। তবে দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটি উত্তম। রবি মৌসুমে মাঝারি থেকে নিচু এবং খরিফ মৌসুমে উঁচু জমিতে সয়াবিন চাষ করা হয়।

জাত

ব্রাগ, ডেভিস, সোহাগ, বাংলাদেশ সয়াবিন ৪, বারি সয়াবিন ৫, বারি সয়াবিন ৬, বিনা সয়াবিন ১ ও বিনা সয়াবিন ২ হলো সয়াবিনের অনুমোদিত জাত। এ জাতগুলো পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেশি দিন টিকে থাকে। ফলন বেশি হয়।

চিত্র ৭.৫.১ সয়াবিন গাছ (ফুল ও ফলসহ)

বপন সময়

আমাদের দেশে রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই সয়াবিন বপন করা যায়। রবি মৌসুমে পৌষ মাসে (মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি) এবং খরিফ মৌসুমে মধ্য শ্রাবণ থেকে মধ্য ভাদ্র (আগস্ট) পর্যন্ত এর বীজ বপন করা হয়।

জমি তৈরি

সাধারণত ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে উপরিভাগ মসৃণ করে নিতে হয়। এছাড়াও বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য পানি

নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শেষ মই দেবার পর ছোট ছোট প্লট তৈরি করে সয়াবিন চাষ করলে পরবর্তীতে আন্তঃপরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

সার প্রয়োগ

মাটির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্ন হয়। সাধারণত: সয়াবিনের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০-৬০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০-১৭৫ কেজি টিএসপি, ১০০-১২০ কেজি এমওপি ও ৮০-১১৫ কেজি জিপসাম সার ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও প্রতি হেক্টরে ২০ টন হারে পচা গোবর বা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সব অজৈব ও জৈব সার ছিটানোর পর শেষ চাষ ও মই দিয়ে মাটি মসৃণ করার পর বীজ বপন করতে হয়। রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বাতাস থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে সয়াবিন গাছের শিকড়ে গুটি (nodule) তৈরি করে। জীবাণুসারের সাথে সয়াবিন বীজ মিশিয়ে বপন করলে শিকড়ে সহজে নডিউল তৈরি হয় এবং নাইট্রোজেন যোগ হয়। জীবাণুসার ব্যবহার করলে ফলনও অনেক বৃদ্ধি পায়। কোন জমিতে সয়াবিন প্রথম চাষ করলে তাতে অবশ্যই জীবাণুসার ব্যবহার করা উচিত। জীবাণুসার ব্যবহার করা হলে ইউরিয়া সার সাধারণত ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। একটি পাত্রে এক কেজি পরিমাণ বীজ নিয়ে ভিজা হাতে বীজ এমনভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে সকল বীজের গা ভিজে যায়। এরপর এই ভিজা বীজের মধ্যে ১৫-২০ গ্রাম জীবাণুসার ছিটিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে সব বীজের গায়ে জীবাণুসার লেগে যায়। জীবাণুসার মিশানোর পর সাথে সাথেই বীজ বপন করতে হয়। বেশিক্ষণ রোদে রাখলে জীবাণুসারের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

বীজহার

প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত: ৫০-৭০ কেজি বীজ লাগে। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০% এর কম নয় এরকম বীজ বপন করা উচিত।

বীজশোধন

বীজশোধক দ্বারা শোধন করে নিয়ে বপন করলে মাটি ও বীজবাহিত অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বপন পদ্ধতি

ছিটিয়ে বা সারিতে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যায়। তবে সারিতে বপন করাই উত্তম। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব রবি মৌসুমে ৩০ সে.মি, খরিফ মৌসুমে ৪০ সে.মি. এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৪-৫ সে.মি. দিতে হয়। রশি ধরে সারি বরাবর ৩-৪ সে.মি. গভীর লাইন টেনে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপন শেষে ছিটিয়ে বুনলে মই দিয়ে এবং সারির বেলায় হাত দিয়ে বীজ ভালোভাবে ঢেকে দিতে হয়।

আন্তঃপরিচর্যা

ক) আগাছা দমন ও চারা পাতলাকরণ : আগাছার প্রকোপ দেখা গেলে চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর একবার তা নিড়ানী দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। এ সময় চারা ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হয়। প্রতি বর্গমিটারে কাঙ্খিত গাছের সংখ্যা রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি রাখা উত্তম।

খ) সেচ ও নিকাশ : ২-৩ বার সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয়। বৃষ্টি না হলে ১ম সেচ চারা গজানোর ২০-৩০ দিন পর এবং ২য় সেচ ৫০-৫৫ দিন পর দিতে হয়। তবে রবি মৌসুমে মাটিতে রস কম থাকলে গাছে ফুল ধরা ও শুটি (pod) গঠনের সময় সম্পূরক সেচ লাগতে পারে। খরিফ মৌসুমে সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না। কোনো কারণে জমিতে পানি জমে থাকলে নিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) পোকা দমন : সয়াবিন ফসলে বিছাপোকা ও কান্ডের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা যায়। বিছাপোকার মথের ডিম ফোটার পর প্রথম অবস্থায় শুককীটগুলো দলবদ্ধভাবে পাতার নিচের দিকে অবস্থান করে এবং পাতা খেয়ে ঝাঁঝড়া করে ফেলে। এ অবস্থায় আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে বিছাপোকা মেরে ফেলতে হয়। কান্ডের মাছি পোকা কান্ড ছিদ্র করে ভিতরের নরম অংশ খায়। সেজন্য আক্রান্ত অংশ বা সম্পূর্ণ গাছ মরে যায়। অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে উভয় পোকাই দমন করা সম্ভব।

ঘ) রোগ দমন : সয়াবিন ফসলে গোড়া পচা এবং পাতার হলুদ বা মোজাইক রোগ পরিলক্ষিত হয়। গোড়া পচা রোগ ছত্রাকের কারণে হয়। জমি সঠিকভাবে চাষ না দিলে এবং স্যাঁতস্যাতে থাকলে এ রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। পাতার হলুদ বা মোজাইক রোগ ভাইরাসের কারণে হয়। এ রোগ দেখা গেলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফসল কর্তন, শুকানো ও মাড়াই

জাত ও মৌসুমভেদে সয়াবিন বীজ বপন থেকে শুরু করে কর্তন পর্যন্ত ৯০-১২০ দিন সময় লাগে। ফসল পরিপক্ক হলে শুটিসহ গাছগুলো হলুদ হয়ে আসে এবং পাতা ঝরে পড়তে দেখা যায়। এ অবস্থায় ফসল কেটে ২/১ দিন রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করে দানাগুলো আলাদা করা হয়। পরে দানাগুলো পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

ফলন : ১.৩-২.৮ টন/হেক্টর।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ভোজ্য তেল উৎপাদনে সয়াবিন পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রধান ফসল হিসেবে উৎপাদিত হয়। বিশ্বে তেল উৎপাদনে সয়াবিন প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এর স্থান সরিষারও পরে রয়েছে। সয়াবিন বীজে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ আমিষ ও ১৯-২২ ভাগ ভোজ্য তেল রয়েছে। এদেশে সয়াবিন গৌণ ফসল হিসেবে চাষ হয়। যার জন্য দেশে ভোজ্য তেলের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রধানত: সয়াবিন তেলই আমদানি করতে হয়। তবে বাংলাদেশে সয়াবিন চাষের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সয়াবিন চাষে আন্তঃপরিচর্যার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

সারাংশ

সয়াবিনের ইংরেজি নাম হলো Soybean এবং বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Glycine max* এ ফসল খুব বেশি বা খুব কম তাপমাত্রা কোনটিই সহ্য করতে পারে না। দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটি সয়াবিন চাষের জন্য উত্তম। ব্রাগ, ডেভিস, সোহাগ ইত্যাদি এর অনুমোদিত জাত। সয়াবিন ফসলে বিছাপোকা ও কান্ডের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা যায়। সয়াবিন ফসলে গোড়া পচা এবং পাতার হলুদ বা মোজাইক রোগ পরিলক্ষিত হয়। গোড়া পচা রোগ ছত্রাকের কারণে হয়। জমি সঠিকভাবে চাষ না দিলে এবং স্যাঁতস্যাতে থাকলে এ রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। পাতার হলুদ বা মোজাইক রোগ ভাইরাসের কারণে হয়। এ ফসল চাষ করতে সাধারণতঃ ৫০-৭০ কে বীজ লাগে। এ ফসলের বীজ পেল থেকে শুরু করে কর্তন পর্যন্ত ৯০-১২০ দিন সময় লাগে। প্রতি হেক্টরে এ ফসলের ফলন ১.৩-২.৮ টন হয়ে থাকে। তেল উৎপাদনের দিক থেকে সয়াবিন বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। সয়াবিন বীজে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ আমিষ ও ১৯-২২ ভাগ ভোজ্য তেল রয়েছে। এদেশে সয়াবিন গৌণ ফসল হিসেবে চাষ হয়। যার জন্য দেশে ভোজ্য তেলের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রধানত: সয়াবিন তেলই আমদানি করতে হয়। তবে বাংলাদেশে সয়াবিন চাষের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সয়াবিন চাষের জন্য কোন মাটি উত্তম?

ক) বেলে মাটি খ) পলি মাটি

গ) এটেল মাটি ঘ) এটেল দোআঁশ মাটি

২। সয়াবিন ফসলে কোন পোকার আক্রমন দেখা যায়?

ক) গান্ধী পোকা খ) কান্ডের মাছি পোকা

গ) লেদা পোকা ঘ) কাটালে পোকা

৩। সয়াবিন বীজে -

i) শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ আমিষ থাকে

ii) শতকরা ১৯-২২ ভাগ ভোজ্য তেল রয়েছে

iii) সয়াবিন এদেশের মূখ্য ফসল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৬ চিনি ফসল : আখ চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চিনি জাতীয় ফসলের সংজ্ঞা লিখতে ও বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন চিনি জাতীয় ফসলের ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক নাম জানতে পারবেন;
- চিনি জাতীয় ফসলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- আধুনিক পদ্ধতিতে আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, আবহাওয়া, বা বপনের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- আখের উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাতের তালিকা তৈরি করতে পারবেন;
- আখ চাষের বিভিন্ন আন্ত:পরিচর্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	চিনি, ইক্ষু, সুগারবীট, পরিখা, সেট বা কাটিং

চিনি জাতীয় ফসল

চিনি বা গুড় উৎপাদনের জন্য যে সব ফসল চাষ করা হয় তাদেরকে চিনি জাতীয় ফসল বলে। আখ ও সুগারবীট চিনি জাতীয় ফসলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলায় আখ চাষ হলো সুগারবীট এখনও তেমনভাবে চাষ করা হয় না। সুগারবীটে চিনির পরিমান আখের চেয়েও বেশি। সারা পৃথিবীতে আখ ও সুগারবীট প্রধান চিনি জাতীয় ফসল হলো বাংলাদেশে আরও কিছু চিনি জাতীয় ফসল আছে। নিচের সারণীতে কিছু ফসলের ইংরেজি ও ইংরেজি নাম দেয়া হল:

চিনি জাতীয় ফসল	ইংরেজি নাম
১. আখ (ইক্ষু)	Sugarcane
২. সুগার বীট	Sugar beet
৩. খেজুর	Date palm
৪. তাল	Palmyra palm

চিনি জাতীয় ফসলের গুরুত্ব

১। চিনি জাতীয় ফসল শর্করা জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। মানুষের মস্তিস্কের সুষ্ঠ বিকাশের জন্য চিনি ও গুড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, আর এই চিনি বা গুড় উৎপন্ন হয় চিনি জাতীয় ফসল থেকে।

২। ইক্ষু বা আখ এর কোন অংশই ফেলে দেয়া হয় না। আখ থেকে চিনি বা গুড়ের পাশাপাশি মোলাসেস তৈরি হয় যা থেকে ইথানল পাওয়া যায়। এই ইথানল বায়োফুয়েল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া ইক্ষুর ছোবড়া (ব্যাগাসী) থেকে কাগজ তৈরির পাল্প পাওয়া যায়।

৩। তাল ও খেজুর গাছ থেকে কাঠ পাওয়া যায় এবং এর পাতা বিভিন্ন হস্ত শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

৪। চিনি ফসলের জমিতে অন্যান্য সাথী ফসল চাষ করে কৃষক দ্বিগুণ লাভবান হতে পারে।

৫। চিনি জাতীয় ফসল চাষ ও এর থেকে চিনি, গুড় ও অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করার জন্য বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়।

৬। চিনি জাতীয় ফসলের চাষ বৃদ্ধি করে চিনি বা গুড় উৎপাদন বাড়িয়ে এসব পণ্য আমদানীর জন্য সে অর্থ ব্যয় হয় তা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব।

৭। ইক্ষু জাতীয় ফসল সব ধরনের জমিতেই জন্মে, তাই যে সব জমিতে অন্যান্য ফসল চাষ করা কষ্টসাধ্য সেসব জমিতে জমি পতিত না রেখে ইক্ষু চাষ করা যায়।

আখ চাষ পদ্ধতি

আখ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল, বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই আখের চাষ করা যায়। তবে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতেই আখের চাষ বেশী হয়। আখ থেকে গুড় ও চিনি তৈরি হয়। বাংলাদেশে প্রায় ১৭০ হাজার হেক্টর জমিতে আখের চাষ হয় এবং তার গড় উৎপাদন ৭-৭.৫ টন/ হেক্টর। এই আখ থেকে ১.৫-২.০টন/হেক্টর চিনি উৎপাদিত হয় এবং গুড় উৎপাদিত হয় হেক্টর প্রতি ৫.৫ টন যা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এই ঘাটতি পুরণ করার জন্য আখের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার।

জলবায়ু

আখ উষ্ণ আবহাওয়ার ফসল। আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় গড় তাপমাত্রা হল ২৫-৩৫° সে আখের পরিপক্কতার সময় ১৮-২২° সে. তাপমাত্রা থাকলে চিনির উৎপাদন ভাল হয়। মাঝারি বৃষ্টিপাত অর্থাৎ সুষমাভাবে বণ্টিত ১২৫-১৫০ সে.মি. বার্ষিক বৃষ্টিপাত আখচাষের জন্য উপযোগী।

জমি নির্বাচন

সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি আখ চাষের জন্য উপযোগী। এঁটেল দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটিতে আখ ভাল জন্মে। তবে একই জমিতে পরপর দুই বছরের বেশি আখ চাষ করা ঠিক নয়। দু বছর পর কমপক্ষে একবছর ঐ জমিতে অন্য ফসল চাষ করা উচিত।

আখের জাত

বর্তমানে বাংলাদেশে আখের অনেকগুলো জাত উদ্ভাবিত হয়েছে এগুলো বাংলাদেশ সুগার ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। জাতগুলো হল:

ঈশ্বরদী ১/৫৩, ঈশ্বরদী ২/৫৪, ঈশ্বরদী ১/৫৫, ঈশ্বরদী ৫/৫৫, ঈশ্বরদী ৯/৫৫, ঈশ্বরদী ১৫,১৬, এলজে-সি, ঈশ্বরদী ১৮-২২; ঈশ্বরদী ২৪-৪০; বিএস আর আই আখ ৪১-৪৫।

জমি তৈরি

আখ একটি দীর্ঘমেয়াদি ফসল তাই মাটি থেকে প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করে। আখের শিকড় মাটির অনেক গভীর পর্যন্ত গিয়ে যেন খাদ্য গ্রহন করতে পারে সেজন্য আখের জমি ভালভাবে ৫-৬টি গভীল চাষ দিয়ে তৈরি করতে হয়। জমি এমনভাবে সমান করতে হবে যেন জমিতে পানি জমে থাকতে না পারে।

রোপন সময়

আখবীজ রোপনের উপযুক্ত সময় হল সেপ্টেম্বর নভেম্বর পর্যন্ত। অতিরিক্ত ঠান্ডায় আখ বীজের চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তাই শীতের সময় বাদ দিয়ে ফ্রেব্রুয়ারি পর্যন্ত রোপন করা যায়।

বীজের হার

৩০-৪০ হাজার সেট বা কাটিং/হেক্টর

আখের বীজ বাছাইকরন ও তৈরি করন :

আখের বংশবিস্তার করা হয় অঙ্গজ পদ্ধতিতে। আখের বীজ নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো যেন অবশ্যই সুস্থ সরল, রোগ ও পোকামুক্ত হয়। কোন পদ্ধতিতে আখ লাগানো হবে তার উপর ভিত্তি করে ১ অথবা ২ চোখ/বাড বিশিই খন্ড করে বীজ তৈরি করতে হবে। এই খন্ডগুলোকে সেট বা কাটিং বলে। আখের সম্পূর্ণ কান্ডই বীজ হিসাবে ব্যবহার হয়, তবে আগার দিকের অংশ বীজ হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয়। বেডে বা ব্যাগে বীজস্থাপনের আগে প্রথমে বীজ পানিতে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে শোধন করে নিতে হবে।

চিত্র ৭.৬.১ : আখের সেট

বীজ রোপন পদ্ধতি

আখ বিভিন্ন পদ্ধতিতে রোপন করা যায়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল।

১। প্রচলিত পদ্ধতি/সমতল পদ্ধতি : মাটিতে ৫-৬ সে. মি অগভীর নালা তৈরি করে ৪৫-৬০ সে.মি. দূরে দূরে সেট বা কাটিং স্থাপন করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত ২টি বাড যুক্ত কাটিং ব্যবহার করা হয়।

২। নালা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে কোদাল দিয়ে ১৫ সেমি গভীর নালা তৈরি করে ৪৫-৬০ সেমি দূরে দূরে কাটিং বসিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

৩। পরিখা পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে ২০-৩০ সেমি গভীর নালা তৈরি করা হয়। এই নালার নীচের দিক ৩০ সেমি এবং উপরের দিক ৪০ সে.মি চওড়া হয়। এই পদ্ধতিতে আখ গাছ ঢলে পড়ে না এবং কম সেচ প্রয়োজন হয়।

৪। চারা স্থানান্তর পদ্ধতি (STP) : এই পদ্ধতিতে প্রথমে পলিব্যাগ অথবা বেডে চারা তৈরি করা হয়। পরে সেই চারা মাঠে নিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপন করতে হয়।

ক) এক সারি পদ্ধতি খ) দেড়া পদ্ধতি গ) জিগজ্যাগ পদ্ধতি

চিত্র ৭.৬.২ : আখ রোপনের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ

সেট বা কাটিং স্থাপন পদ্ধতি :

ক) এক সারি পদ্ধতি (মাথা মাথা পদ্ধতি)
খ) দুই সারি পদ্ধতি
গ) দেড়া পদ্ধতি/ওভারলেপিং পদ্ধতি
ঘ) জিগজ্যাগ পদ্ধতি/ এলোমেলো পদ্ধতি

সার প্রয়োগ

ভালো ফসলের জন্য আখ চাষের সময় সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। নিচে আখের জমিতে ব্যবহৃত সারের পরিমাণ দেওয়া হল :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
গোবর	১০-১২ টন
ইউরিয়া	১৩০-১৫০
টিএসপি	৮০-১১০
এমপি	১২০-১৪০
জিপসাম	৬০-৭০
জিংক সালফেট	১০-১৫
ডলোচুন	১৭০

জমি তৈরির সময় সম্পূর্ণ গোবর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম ও জিংকসালফেট জমি তৈরির পর নালা তৈরি করে তার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। অর্ধেক ইউরিয়া এবং এমপি চারা রোপনের সময় এবং বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি কুশি গজানোর সময় মাটিতে ছিটিয়ে দিতে হবে মাটি যদি বেশি এসিডিক হয় তখন তাতে ডলোচুন ব্যবহার করতে হবে।

আখের আন্তঃপরিচর্যা

১। আগাছা দমন ও গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া : আখের জমিতে ৪-৫ বার আগাছা দমন করতে হবে, বিশেষ করে চারা গজানোর পর ৩-৪ মাস পর্যন্ত আখের জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা বয়স ৭-৮ সপ্তাহ হলে প্রথমবার এবং ১২-১৪ সপ্তাহ বয়সে দ্বিতীয় বার আখের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে ফলে গাছ হেলে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং শিকড়ের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

২। ঠেস দেওয়া : ঝড় বাতাস ও শেয়ালের উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য আখের ৩-৪টি ঝাড় একসাথে করে ঠেস দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

৩। সেচ ও পানি নিকাশ : প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে পানি সেচ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত পানি যেন জমে না যায় সেজন্য তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। শুকনা পাতা পরিষ্কার আখের ফলন বাড়ানোর জন্য গাছের পাতা শুকিয়ে গেলে সেগুলো পষ্কিার করতে হবে।

আখের ক্ষতিকর পোকামাকাড় ও দমনব্যবস্থা

চিত্র ৭.৬.৩ : ডগার মাজরা পোকা

১। ডগার মাজরা পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : পোকার কীড়াগুলো পাতার মধ্যশিরা ছিদ্র করে এবং পাশদিয়ে নালা তৈরি করে কান্ডের ডগায় পৌছে যায় কান্ডের নরম অংশ খেয়ে ফেলে এবং ফলে গাছ আর বাড়তে পারে না।

দমন ব্যবস্থা ক) আক্রান্ত গাছ কেটে ধ্বংস করতে হবে। বয়স্ক পোকা মথ ও কীড়া ধ্বংস করতে হবে কীটনাশক ফুরাডান ৫জি একর প্রতি ১৬ কেজি হারে গাছের দুই সারির মাঝে নালা করে মাটির সাথে মিশিয়ে নালাতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

চিত্র ৭.৬.৪ : কান্ডের মাজরা পোকা

২। কান্ডের মাজরা পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : প্রথমে গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে যায় এবং পরে আখের পাতা মরে যায়। কান্ডে অনেক ছিদ্র থাকে এবং এগুলো দিয়ে গুড়ো গুড়ো হলুদাভ পদার্থ বের হয়ে এসে কান্ডে লেগে থাকে।

৩। পিঙ্গল মাজরা পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : আখের মাইজ মরে যায় এবং টান দিলে তা সহজেই উঠে আসে। গাছের গোড়ার দিকে পোকা প্রবেশ করার চিহ্ন দেখা যায়। এখানে প্রচুর বিষ্টা দেখা যায় ও দুর্গন্ধ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থা : ক) ডিমের গাদা ধ্বংস করতে হবে। খ) আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে মথ ধ্বংস করতে হবে। গ) আক্রান্ত গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ঘ) ডায়াজিন ৬০ ইসি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৪। উইপোকা

ক্ষতির লক্ষণ : লাগানো আখ খন্ডের দুইপাশ দিয়ে প্রবেশ করে ভেতরের অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে রোপা আখের খোসাটি শুধু পড়ে থাকে, গাছ জন্মাতে পারে না আখ গজাবার পর আক্রমণ করলে চারাগুলো হলুদ হয়ে যায় এবং টান দিলে সহজেই উঠে আসে।

দমন ব্যবস্থা : ক) আক্রান্ত জমিতে মুড়ি আখ চাষ করা যাবে না। খ) সম্ভব হলে জমিতে প্লাবন সেচ দিয়ে জমি কয়েকদিন ডুবিয়ে রাখতে হবে। গ) শুকনো পাটকাঠি হাড়ির মধ্যে ভরে তা মাটিতে পুড়ে রাখতে হবে। এতে উইপোকা এসে জমা হয়। ১৫ দিন পর পর সেগুলো উঠিয়ে ধ্বংস করতে হবে। ঘ) ক্ষেতের আশে পাশে উইপোকার ঢিবি থাকলে তা ভেঙ্গে দিয়ে ডাসবান ২০ ইসি ২৫০ মিলিলিটার ১০ গ্যালন পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ঙ) ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করা যায়।

আখের রোগ ও দমন ব্যবস্থা

১। লাল পঁচা রোগ (Red rot)

রোগের কারণ : ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়।

লক্ষণ : এ রোগের ফলে প্রধানত আখের কান্ড পঁচে যায়। আক্রান্ত পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। আখের কান্ড কাটলে দেখা যায় ভেতরের কোষগুলো পচে লাল রং ধারণ করেছে। এর মধ্যে আড়াআড়িভাবে ছোপ ছোপ সাদা অংশ দ্বারা বিভক্তি দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

ক) রোগ সহিষ্ণু বা প্রতিরোধক জাত ব্যবহার করা

খ) বীজ আখ বপনের পূর্বে শোধণ করে নিতে হবে ১৫-২০ মিনিট ১% কার্বনডাজিম এর পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

গ) আক্রান্ত আখ উঠিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

ঘ) ব্যাভিস্টিন (০.১%) অথবা বাইনালেট ৭০% ডব্লিওপি (০.১%-০.১৫%) ১০-১২ দিন পরপর পাতায় স্প্রে করা যেতে পারে।

২। স্মাট রোগ (Smut Disease)

রোগের কারণ : ছত্রাকের জন্য এই রোগ হয়।

লক্ষণ : আক্রান্ত গাছে পাতাগুলোর মধ্যে একটি চাবুকের মত লম্বা লিকলিকে ও কালো বর্ণের শীষ উৎপন্ন হয়। প্রথম দিকে কালো শীষটি পাতলা একটি রূপালি পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে যার ভেতরে কালো কালো অসংখ্য স্মাট রোগের জীবাণু থাকে। এই রূপালি পর্দা ফেলে গিয়ে রোগের জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। স্মাট আক্রান্ত আখের ঝাড়ে অসংখ্যা কুশি বের হয় এবং এগুলো দেখতে ঘাসের মত মনে হয়।

দমন ব্যবস্থা

ক) রোগ প্রতিরোধ/সহিষ্ণু জাত চাষ করতে হবে।

খ) স্মাট আক্রমণ হলে সে জমিতে মুড়ি ফসল চাষ করা যাবে না।

গ) প্রয়োজনে ছত্রাক নাশক ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) আক্রান্ত ঝাড় জমি থেকে উঠিয়ে ধ্বংস করতে হবে

ঙ) প্রয়োজনে ছত্রাক নাশক ব্যবহার করতে হবে।

৩। উইল্ট রোগ :

কারণ : ছত্রাক

লক্ষণ : এই রোগ অনেকটা লাল পঁচা রোগের মতই পাতা গুলো হলুদ হয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত কান্ড লম্বালম্বিভাবে কাটলে ভেতরে লাল রং দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা :

ক) বীজ আখ লাগানোর আগে ০.১% ব্যাভিস্টিন দ্রবণে (পানি ও ব্যভিসিটন এর অনুপাত ১০০:১) ৩০ মিনিট ধরে চুবিয়ে রেখে শোধণ করতে হয়।

খ) রোগাক্রান্ত গাছ উঠিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

আখ পরিপক্কতার লক্ষণ

সাধারণত আখ পরিপক্ক হতে ১২ থেকে ১৫ মাস সময় লাগে। মাঠে রিফ্রেক্টোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আখের মিষ্ঠতা পরিমাপ করে পরিক্কতা নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া আখ পরিপক্ক হলে কানেডর বৃদ্ধি থেমে যায়। পাতার হলুদ হতে থাকবে এবং কান্ডের কোন কিছু দিয়ে কান্ডের আঘাত করলে ধাতব শব্দ হবে, এসব লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে আখ কাটার সময় হয়েছে।

ফসল কাটা

আখ পরিপক্ক হওয়ার পরপরই ধারালো ছুরি দিয়ে গোড়া থেকে কেটে নিতে হবে। এরপর পাতা ছাড়িয়ে গুড় বা চিনির জন্য মাড়াই করতে হবে। আখ পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথেই মাড়াই করতে হবে তা না হলে গুড় বা চিনির পরিমাণ কম হবে।

ফলন

আখের ফলন ৪০-৫০ টন/হেক্টর

মুড়ি আখ

প্রথমবার আখ কেটে নেওয়ার পর পরিত্যক্ত মাথা বা মুড়ি থেকে ঐ একই জমিতে আবারও আখ উৎপাদনকে মুড়ি আখ চাষ বলে। বিনা চাষে এবং বিনা বীজে এই চাষ করা যায় এবং অল্প খরচে কৃষক অতিরিক্ত ফসল ফলাতে পারে। তবে একবার মুড়ি ফসল করার পর হয় যা ঐ একই জমিতে মুডি ফসল করা উচিত নয় কারণ তাতে রোগ ও পোকামাকড়র আক্রমণ বেড়ে যায় এবং জমির মাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী আখ চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করবে।

সারাংশ

আখ ও সুগারবীট চিনি জাতীয় ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। আখ সাধারণত: অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করা হয়। আকের সেট বা কাটিং বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আখের প্রধান পোকা মাজরা এবং উই পোকা। লাল পঁচা রোগ স্মাট রোগ, আখের রোগ আখের পরিপক্কতা পরিমাপ করা হয় রিফ্রাক্টেমিটার যন্ত্র দ্বারা। বিন চাষে এবং বিনা বীজে চাষকৃত আখকে মুড়ি আখ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আখের জন্য সুষমভাবে বণ্ঠিত প্রয়োজনীয় বার্ষিক বৃষ্টিপাত কত?

ক) ১২৫-১৫০ সে.মি খ) ১০০-১১০ সে.মি

গ) ৯০-১০০ সে.মি ঘ) ১৫০-১৬০ সে.মি

২। আখের বীজ হার কত?

ক) ৫-১০ হাজার কাটিং/হেক্টর খ) ৩০-৪০ হাজার কাটিং/হেক্টর

গ) ২০-২৫ হাজার কাটিং/হেক্টর ঘ) ১০-১৫ হাজার কাটিং/হেক্টর

পাঠ-৭.৭ আঁশ ফসল : পাট চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আঁশ জাতীয় ফসল কী তা বলতে পারবেন;
- আঁশ জাতীয় ফসলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু, জমি, প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে লিখতে ও বলতে পারবেন;
- পাট চাষে সারের পরিমাণ ও কীভাবে সার প্রয়োগ করবেন তার বিবরণ দিতে পারবেন;
- বীজহার, বপনের সময় ও বপন পদ্ধতি সম্পর্কে লিখতে ও বলতে পারবেন।
- পাট কাটার উপযুক্ত সময় উল্লেখ করতে পারবেন;
- পাটের ফলন বলতে পারবেন;
- পাটের গুণগত মান পাওয়ার জন্য উপযোগী যথার্থ সংগ্রহের প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জলবায়ুর, পাটের জাত, তোষা পাট, বীজহার, রিবন রেটিং

আঁশ জাতীয় ফসল (Fiber Crops)

যে সকল ফসল আঁশ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে চাষ করা হয় তাদেরকে আঁশ জাতীয় ফসল বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আঁশ জাতীয় ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব ফসল তথে উৎপাদিত আঁশ দিয়ে বস্ত্র, চট, থলে, কার্পেট, কাগজের মন্ড, দড়ি, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য তেরি করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান আঁশ ফসল তারপরই তুলার স্থান, বাংলাদেশে উৎপাদিত আশ ফসল নিম্নে উল্লেখ করা হল:

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান আঁশ জাতীয় ফসল হল:

বাংলার নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
পাট (তোষা)	Jute (Tosha)	Corehorus olitorius
পাট (দেশী)	Jute (Local)	Corchorus Capsularis
তুলা (কার্পাস)	Cotton	Gossypium arboreum
তুলা (শিমুল)	Silk Cotton	Gossypium arboreum
কেনাফ	Kenaf	Hibiscus cnnabinus
শন পাট	Sunhemp	Crotalaria juncea
মেস্তা	Mesta	Hibiscus sabdariffa

আঁশ জাতীয় ফসলের গুরুত্ব

১। আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানী পণ্য হল বস্ত্র শিল্প এই বস্ত্রশিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল আঁশ ফসল থেকে উৎপাদিত আঁশ।

২। পাটের আঁশ দিয়ে বস্তা, চটের ব্যাগ, দড়ি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের পাট দিয়ে বিভিন্ন সৌখিন পণ্য যেমন ব্যাগ, স্যান্ডেল, ঘর সাজানোর বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পণ্যগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যা বিদেশে বাংলাদেশে পাটের তৈরি দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩। আঁশ জাতীয় ফসল (যেমন তুলা) দিয়ে লেপ, তোষক ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

৪। পাটের বীজের ঔষধী গুণ রয়েছে। তুলা বীজের তেল থেকে সাবান তৈরি হয়। তুলা বীজের তেল নিষ্কাশনের সময় যে খৈল তৈরি হয় তা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫। কচি অবস্থায় পাট পাতা শাক হিসেবে খাওয়া হয় যা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও জনপ্রিয় সবজি।

৬। ব্যান্ডেজ, গজ, ব্লটিং পেপার ইত্যাদি তৈরিতেও আঁশ জাতীয় ফসল ব্যবহৃত হয়।

পাট চাষ

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এদেশের প্রায় সব জেলায় পাটের চাষ হয়। গত কয়েক বছরে পাটের তৈরি বিভিন্ন পণ্য যেমন, ব্যাগ, বস্তা, জুতা এমনকি শাড়ী বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং বিদেশের বাজারে এসব পণ্য রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি উৎপাদনের জন্য এর আধুনিক চাষপদ্ধতি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু

পাট উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার ফসল, পাট উৎপাদনের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা হল ২৫-৩৫° সে. এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৯০%। পাট চাষের সময় সুষমভাবে বর্ণিত ১২৫-২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত উপকারী চাষ অবস্থায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ক্ষতিকর।

মাটি

পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব পদার্থযুক্ত দোঁআশ মাটি পাটের জন্য ভাল। বেলে দোআশ বা এটেল দোঁআশ মাটিতে পাট চাষ করলেও ভাল ফসল পাওয়া যায়, এঁটেল মাটিতে পানি জন্মে থাকে বলে তা পাট চাষের জন্য উপযোগী নয়।

জমি নির্বাচন

উঁচু, মাঝারি নিচু এবং মাঝারি নিচু জমি অর্থাৎ যে জমিতে বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না বা জমে গেলেও নিষ্কাশন করা সম্ভব তেমন জমিই পাট চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি

পাটের জন্য নির্বাচিত জমি ৫-৭ টি চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। পাটের বীজ খুবই ছোট, এবং পাট গাছের মূল মাটির ১ ফুট গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করে বলে মাটি গভীরভাবে চাষ করতে হবে এবং মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করতে হবে। সাধারণত মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির পর জো অবস্থায় জমি চাষ করতে হয়।

পাটের জাত

পাটের প্রধান প্রজাতি ২টি :

১। দেশী পাট : *Corchorus capsularis*
২। তোষা পাট : *Corchorus olitorius*

দেশি পাটের জাতসমূহ : ডি-১৫৪-২' সিভিএল-১ (সবুজ পাট), সিভিই-৩ (আশু পাট), সিসি-৪৫ (জো পাট); এটম পাট-৩৮, বিজেআরআই দেশী পাট-৫; বিজেআরআই দেশি-৬, বিজেআরআই দেশি পাট-৭, বিজেআরআই দেশি-৮।

তোষাপাটের জাতসমূহ : ফাল্গুনী তোষা (ও-৯৮৯৭), ওএম-১, ৩-৪, ৩-৭২, বিজেআরআই তোষা পাট-৪, বিজেআর আই তোষা পাট-৫, ৩-৭৯৫, বিজেআরআই তোষা পাট-৬ (ও-৩৮২০)।

বীজ বপনের সময়

বাংলাদেশের কৃষি ঋতুর ভিত্তিতে পাট উৎপাদনের জন্য খরিপ-১ ঋতু হল উপযুক্ত সময় (মার্চ-এপ্রিল থেকে জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত) দেশি পাট সাধারণত ১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই মে এই সময়ের মধ্যে বুনতে হয়। তবে কোন জমিতে যদি জুলাই আগষ্টের দিকে বর্ষার পানি জমার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে জমিতে কিছুটা আগাম বীজ বোনা উচিত।

বীজ হার : সারিতে বপন :
দেশী পাট : ৬-৭ কেজি/হেক্টর
তোষা পাট : ৪-৫ কেজি/হেক্টর

ছিটিয়ে বপন :
দেশি পাট : ৮-১০ কেজি/হেক্টর
তোষা পাট : ৬-৮ কেজি/হেক্টর

বীজ শোধন

বোনার আগে জীবানুমুক্ত করার জন্য বীজ শোধন করে নেয়া ভাল। প্রতি কেজি বীজের সাথে ৬ গ্রাম এগ্রোসান-জিএন বা সেরিসান অথবা ২ গ্রাম ক্যাপটান ৬ গ্রাম এগ্রোসান জিএন বা সেরিসান অথবা ২ গ্রাম ক্যাপটান ৭৫% বা ব্যাভিসটিন ৫০% ঔষধ বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

বপন পদ্ধতি

পাট ছিটিয়ে ও সারিতে দুইভাবেই বপন করা যায়। এদেশের কৃষকেরা ছিটিয়ে বপন করে বেশি, যদিও সারিতে বপন করলে ফলন বেশি পাওয়া যায় এবং পরিচর্যা করতে সুবিধা হয় লাইন করে লাগালে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি. এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৭-১০ সেমি. হওয়া উচিত।

চারা পাতলাকরণ

সারি পদ্ধতিতে পাট লাগালে হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫ লাখ চারা কাম্য। চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর একবার ঘন স্থানে যে চারাগুলো দুর্বল সেগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর আরও একবার চারা পাতলা করে দিতে হবে।

আগাছা দমন

পাট বীজ বপনের ৮ সপ্তাহের মধ্যেই ২-৩ বার নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে। তাছাড়া চারা পাতলাকরণের সময়ও আগাছা দমন করে নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।
সার প্রয়োগ : পাটের ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নীচের টেবিলে দেওয়া হল : একর প্রতি

সারের নাম	সারের পরিমাণ
গোবর	৫-৬ কেজি
ইউরিয়া	১৭০-২০০ কেজি
টিএসপি	৫০-৮০ কেজি
এমপি	৬০-৯০ কেজি
জিপসাম	৫০-৮০ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	১১-৩০ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি
জমি তৈরির সময় সম্পূর্ণ গোবর, জিংকসালফেট ও জিপসাম জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপনের আগে শেষচাষের সময় টিএসপি ও এমপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার তিন ভাগ করে প্রথম ভাগ চারা গজানোর ৬-৭ দিন পর, দ্বিতীয় ভাগ ৪৫ দিন পর এবং শেষভাগ ৬০ দিন পর, দ্বিতীয় ভাগ ৪৫ দিন পর এবং সার প্রয়োগের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন সার কচি পাতার উপর না পড়ে। তাহলে পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতিবার আগাছা দমন করে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রস থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ : বীজ বপন করার সময় জমি যদি বেশি শুষ্ক হয় তাহলে হালকা সেচ দিতে হবে। পাটের চারার দৈহিক বৃদ্ধির সময় বৃষ্টি না হলে বা জমিতে রস না হলে হালকা সেচ দিতে হবে। পাট জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, এতে চারাগাছ মারা যায় এবং বয়স্ক সারের শিকড় নষ্ট হয়ে পাটের গুণগত মান খারাপ হয়ে যায়। তাই পাটের জমিতে কোন অবস্থাতেই পানি জমে থাকতে দেওয়া যাবে না এবং দ্রুত তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সফল পাট উৎপাদনের জন্য পাট কাটার উপযুক্ত সময় এবং সংগ্রহ পরবর্তী অন্যান্য প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পাটের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা

১। পাটের বিছাপোকা :

ক্ষতির লক্ষণ : সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এদের আক্রমণ দেখা যায়। এরা কচি ও বয়স্ক সবধরনের পাতার সবুজ আঁশ খেয়ে ফেলে।

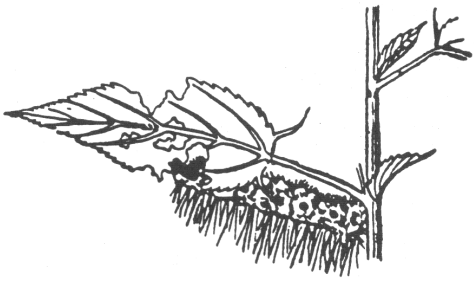

চিত্র ৭.৭.১ : পাটের বিছাপোকা

দমন ব্যবস্থা :

ক) পাটের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে পাতা গুলো সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

খ) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডায়াজিনন ৬০% তরল/নভুক্রিন ৪০% তরল অথবা অন্য যেকোন অনুমোদিত কীটনাশক প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৩০লিটার পানিতে ৪৫ গ্রাম ঔষধ মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হবে।

গ) বিছাপোকা যেন ছড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য আক্রান্ত জমির চারপাশে নালা তৈরি করে তাতে কেরোসিন মিশ্রিত পানি নালায় দিতে হবে।

২। উড়চুঙ্গা পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : জমিতে গর্ত করে বাস করে এবং সেখান থেকে বের হয়ে চারা গাছের গোড়া কেটে দেয়।

দমন ব্যবস্থা

ক) জমিতে পানি সেচ দিলে গর্ত থেকে পোকা বের হয়ে আসবে, তখন সেগুলোকে ধ্বংস করতে হবে।

খ) বিষটপ ব্যবহার করে এই পোকা দমন করা যায়

গ) রিপকর্ড ১০ ইসি অনুমোদিত মাত্রায় ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে।

৩। পাটের ঘোড়া পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : পাটের ডগার কচি পাতা খেয়ে ফেলে, ফলে শাখা প্রশাখা বের হয় ও আঁশের মান খারাপ হয়।

চিত্র ৭.৭.২ : পাটের ঘোড়া পোকা

দমন ব্যবস্থা

ক) পোকার আক্রমণ হলে কেরোসিন ভেজানো দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে নিলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

খ) খেতে ডাল বা লাঠি পুতে পাখির বসার ব্যবস্থা করলে শালিক ময়না ইত্যাদি পাখি ঐ সব ডালে এসে বসবে এবং পোকা খেয়ে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিবে।

গ) ডায়াজিনন ৬০% তরল/ইনলাক্স ২৫% তরল অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

৪। চেলে পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : এদের আক্রমণে গাছের ডগা মরে যায় ও শাখা প্রশাখা বের হয় এরা কান্ডের উপর ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। আক্রান্ত স্থান থেকে আঠা বের হয় এবং পোকার মলের সংগে মিশে আঁশের উপর কালো দাগ তৈরি হয়, ফলে আঁশের মান কমে যায়।

চিত্র ৭.৭.৩ : পাটের চেলে পোকা

দমন ব্যবস্থা

ক) ক্ষেতের আশপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতেহবে।

খ) আক্রান্ত পাঠগাছ নষ্ট করে ফেলতে হবে

গ) অনুমোদিত কীটনাশক যেমন রীডা ১০ লিটার পানিতে ২৫ মিলি-লিটার মিশিয়ে প্রতি শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।

৫। মাকড়

ক্ষতির লক্ষণ : আগার কচি পাতার রস চুষে খায়, ফলে পাতা কুঁকড়ে যায় এবং শুকিয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থা

ক) কাঁচা নিম পাতার রস এবং পানি ২ঃ৫ অনুপাতে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

খ) আক্রমণ বেশি হলে থিওভিট ৮০% পাউডার ১ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

পাটের রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

১। পাটের গোড়াপঁচা রোগ

লক্ষণ : গাছের গোড়ায় লালচে দাগ তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে গোড়া সম্পূর্ণ পঁচে গিয়ে গাছ উপড়ে পড়ে যায়।

প্রতিকার : ব্লিটক্স ২.৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হবে।

২। কান্ড পঁচা রোগ

লক্ষণ : পাতা ও কান্ডে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত যে কোন স্থানেই এ রোগ দেখা যায়। পরে গাছ মরে যায়।

প্রতিকার : ৩৫ গ্রাম কম্পেনিয়ন ঔষধ ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে রোগের আক্রমণ কমানো যায়।

৩। কালো পট্টি রোগ

লক্ষণ : কান্ডে কালো রিং বা কেটনীর মত দাগ পড়ে আক্রান্ত স্থান ঘষলে আঙ্গুলে কালো গুড়োর দাগ লেগে যায়।

প্রতিকার :

ক) বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করতে হয়।

খ) আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ধ্বংস করতে হবে

গ) প্রোপিকোনাজল ০.৫ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪। শুকনো ক্ষত রোগ

লক্ষণ : রোগের আক্রমণে চারাগাছ ঝলসে যায়। বড় গাছের কান্ডে কালো কালো দাগ পড়ে, আক্রান্ত স্থান ফেটে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়।

প্রতিকার :

৩৫ গ্রাম ডাইথেন এম ৪৫ প্রতি ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করলে রোগের আক্রমণ করে যায়।

৫। ঢলে পড়া রোগ

লক্ষণ : চারা গাছ ঢলে পড়ে যায়

প্রতিকার : ক) আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করতে হবে

খ) জমির পানি নিষ্কাশন করতে হবে।

গ) ব্লিটক্স ২.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে রোগের আক্রমণ কমানো যায়।

৬। মোজাইক রোগ

লক্ষণ : ভাইরাসের আক্রমণে পাতার হলদে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। পাতার শিরাত হলদে হয়ে যায়।

প্রতিকার :

ক) আক্রান্ত গাছ জমি থেকে উঠিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

খ) সাদা মাছি এ রোগ ছড়ায়, তাই এই মাছি দমন করতে হবে।

গ) রোগমুক্ত সুস্থ বীজ বপন করতে হবে।

পাট কাটা

আঁশ উৎপাদনের জন্য সাধারণত বীজ বোনার ৪-৫ মাসের মধ্যে পাট কাটতে হয়। বর্ষার পানিতে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে প্রয়োজনে আরও আগে পাট কাটতে হতে পারে গাছে ফুল আসা শুরু করলেও বোঝা যায় পাট পরিপক্ক হয়েছে।

ফুল থেকে ফল হওয়ার সময় পাট কাটলে ফলন বেশি হয় এবং ভাল মানের আঁশ পাওয়া যায়। সাধারণত কাস্তে বা হেঁসো দিয়ে পাটগাছ একেবারে গোড়া থেকে কাটতে হয়।

ফলন

দেশি পাটের ফলন হেক্টর প্রতি ৪-৫৫ টন এবং তোষা পাটের ফলন প্রতি হেক্টর ৪.০-৪৫.০ টন। প্রক্রিয়াজাত করে কাঁচা পাটের শতকরা ৫ ভাগ আঁশ এবং ১৫ ভাগ পাটকাঠি পাওয়া যায়।

সংগ্রহের প্রযুক্তি

পাটগাছ বাছাইকরণ ও আটি বাঁধা : কাটা পাটগুলোর মধ্যে ছোট বড় চিকন মোটা পাটগুলোকে আলাদা করতে হবে কারণ ছোট ও চিকন পাট গাছ মোটা ও বড় গাছ অপেক্ষা দ্রুত পচে। তাই পচন প্রক্রিয়া যাতে সুষম ও সটিক হয় সেজন্য এ সমস্ত বিভিন্ন ধরনের পাটকে পৃথক করে আলাদা আলাদা আঁটি বাঁধতে হবে। সাধারণত ১৫-২০ সে.মি. ব্যসের আঁটি বাঁধা হয়। পাতা ঝরানো ও গোড়া ডুবানোর পাটের আঁটি বেঁধে জমিতে ৩/৪ দিন ফেলে রেখে পাতা ঝরানো হয়। এই সময় গাছগুলো কিছুটা শুকিয়ে যাবে। পাট গাছের গোড়ার দিক অন্য অংশের চেয়ে বেশি মোট বলে পঁচতে সময় বেশি লাগে। এজন্য অনেকসময় জাক দেবার আগে আটিগুলোর গোড়ার দিকের ৬০-৭০ সে.মি. অংশ খাড়াভাবে পানিতে ৩/৪ দিন ডুবিয়ে রাখা হয়।

জাগ দেওয়া পাট গাছ পঁচানোর জন্য আটিগুলোকে সাজিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখাকে জাগ দেওয়া বলে। পরিষ্কার ও অল্প স্রোতযুক্ত পানিতে জাগ দেওয়া ভাল। জাগ দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন, জাগের উপর কমপক্ষে ১০-১৫ সে.মি. পানি থাকে এবং নীচে যথেষ্ট পানি থাকবে যেন জাগ মাটির সংস্পর্শে না আসে। যদি এ ধরনের জলাশয় না পাওয়া যায় তাহলে বদ্ধ পানিতেও জাগ দেওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে প্রতি ১০০ আটির জন্য ১ কেজি ইউরিয়া সার জাগের উপর ছিটিয়ে দিলে পাট তাড়াতাড়ি পঁচে। জাগ দেওয়ার সময় প্রথমে এক প্রস্থ আটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দ্বিতীয় প্রস্থ আঁটি আড়াআড়িভাবে সাজানো হয়। এভাবে আটিগুলোকে সাজিয়ে পাশাপাশি গোড়া মাথা নিয়মে পাট গাছ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর এগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। জাগ ডুবানোর জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায় হল জাগের দুই পাশের আবহাওয়ায় ১২-২৫ দিনে পাট পচে।

আঁশ ছাড়ানো ও ধৌতকরণ

আঁশ সহজেই পৃথক হয়ে গেলে এবং একটির সাথে অন্যটি লেগে না থাকলে বুঝলে হবে পাট পচে গিয়েছে। শুকনো স্থানে একটি বা দুটি পচানো পাটগাছ থেকে একটু আশ ছাড়িয়ে তারপর সম্পূণ গাছ থেকে আঁশ ছাড়ানো হয়। এভাবে কয়েকটি পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়িয়ে ভালভাবে ধৌত করা হয়।

আঁশ শুকানো ও সংরক্ষণ

রৌদ্রযুক্ত স্থানে বাঁশের আড়, ঘরের চাল বা রেলিং এ ঝুলিয়ে পাট শুকানো হয়। ধুলাবালি বা কাঁদা না লাগে, ভালভাবে শুকিয়ে তা একত্রে বেঁধে রাখা হয়। ভেজা পাট কখনই গুদামজাত করা ঠিক নয়, কারণ এতে আঁশের গুণগত মান নষ্ট হয়।

পাট পঁচানোর রিবন রেটিং পদ্ধতি

পাট পঁচানোর জন্য পর্যাপ্ত পানি না পাওয়া গেলে এই পদ্ধতিতে পাট পচানো যায়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনিস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন সেখানে কাঁচা অবস্থাতেই পাট থেকে ছাল ছাড়িয়ে পরে অল্প পানিতে তা পঁচানো হয়। এই পদ্ধতিতে পাট থেকে পাতা ঝরে যাওয়ার পর হাতুড়ির সাহায্যে পাট গাছের গোড়া থেতলে দেওয়া হয়। এরপর একটি বাঁশের খুটির মাথা ইংরেজি ঠ অথবা ট অক্ষরের মত তৈরি করে খুটিটি পুতে নিতে হয়। এরপর ছালসহ পাটগাছ V অথবা U এর মাঝখানে রেখে ছাল দুই দিকে টান দিলে কাঠি থেকে পাটের ছাল পৃথক হয়ে যায়। এভাবে কয়েকটি গাছ থেকে ছাল ছাড়িয়ে সেগুলো একত্রে আঁটি বাঁধা হয়। এই আটিগুলো পরবর্তীতে একটি বড় চাড়ি বা অন্য কোন পাত্রে পানির মধ্যে রেখে পচানো হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাটের বিভিন্ন রোগ বালাই ও পোকামাকড় পর্যবেক্ষণ করে এর উপর প্রতিবেদন লিখতে হবে।

সারাংশ

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। পাট ও পাট জাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাট সাধারণত: দেশি পাট ও তোষা পাট প্রজাতির হয়ে থাকে। পাটের ক্ষতিকর পোকার মধ্যে বিছাপোকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও উড়চুঙ্গা, পাটের ঘোড়া পোকা, চলে পোকা, মাকড় ইত্যাদি। রোগের মধ্যে গোড়াপঁচা রোগ, কান্ড পঁচা রোগ, কালো পট্টি রোগ, ঢলে পড়া রোগ, মোজাইক রোগ প্রধান। রিবন রেটিং পদ্ধতি পাটের ছাল পৃথক করা হয় পরে পাত্রের পানির মধ্যে পঁচানো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেশি পাটের জাত কোনটি?
ক) সি ভি ই-৩ (আশুপাট) খ) ফাল্গুনি তোষা
গ) ও এম-১ ঘ) বিজেআরআই তোষা পাট-৪

২। সারিতে বপনের জন্য তোষা পাটের বীজহার কত?
ক) ১-২ কেজি/হেক্টর খ) ৪-৫ কেজি/হেক্টর
গ) ৮-১০ কেজি/হেক্টর ঘ) ১৪-১৫ কেজি/হেক্টর

৩। আঁশের ফলন ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে পাট কখন কাটবেন?
ক) গাছে ফল পাকার সময় খ) ফুল ফোটার সময়
গ) বীজ বোনার তিন মাস পর ঘ) ফুল থেকে ফল ধরার সময়

৪। জাক ডুবানোর উত্তম পদ্ধতি কোনটি?
ক) কলা গাছ দিয়ে জাক ডুবানো খ) কাদামাটি দিয়ে জাক ডুবানো
গ) দুটি খুঁটি ও দড়ির সাহায্যে জাক ডুবানো
ঘ) কাঠের গুড়ি দিয়ে জাক ডুবানো

পাঠ-৭.৮ তুলা চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তুলা চাষের জন্য উপযোগী জমি ও আবহাওয়া সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;
- তুলা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার এর মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- তূলা সংগ্রহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- তুলার প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অতিরিক্ত তুলা (ফাজ), জিনিং, জিওটি, গাট বাঁধা, জাবপোকা, বোলওয়ার্ম

তুলা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আঁশ জাতীয় ফসল, বাংলাদেশে তুলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বস্ত্রখাতে ব্যবহৃত আঁশের ৭০-৭৫% আসে তুলা থেকে। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে বর্তামানে ৫৪ লাখ বেল তুলার প্রয়োজন যার মাত্র ৩% দেশে উৎপন্ন হয়। এ চাহিদা পুরণের জন্য বিদেশ থেকে তুলা আমদানি করতে হয়। তাই বাংলাদেশে তুলা উপযোগী অঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে তুলা চাষ করে তুলার চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

চিত্র ৭.৮.১ : তুলা গাছের বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান

তুলা চাষ

মাটি ও জলবায়ু : তুলা উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া পছন্দ করে। চারাগাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য ২৪-৩৩° সে. তাপমাত্রা উপযোগী তুলাগাছ অতিবৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। বার্ষিক ১০০ সে.মি. বৃষ্টি তুলার জন্য উত্তম। সবধরনের মাটিতেই তুলাগাছ জন্মে। তবে বৃষ্টি পানি জমে থাকে না এমন উঁচু জমি ভাল, দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। মাটির পিএইচ (এম) ৬-৭.৫ হলে ভাল হয়।

জমি তৈরি

তুলা চাষের জন্য জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে কারণ তুলা গাছের মূল মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করে। সেজন্য জমি ৬-৮টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হবে যেন কোথায় পানি জমতে না পারে।

বীজ বপনের সময়

রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই বীজ বপন করা যায়।

রবি মৌসুম : মধ্য শ্রাবণ-ভাদ্র মাস, খরিফ মৌসুম : জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাস

বীজের হার

শতকরা ৮০ ভাগ বা তার অধিক অংকুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন ৮-১০ কেজি/হেক্টর বীজ প্রয়োজন, বীজবাহিত রোগ দমনের জন্য ভিটাডেক্স-২০০/পেনকোজে দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। [২-৩ গ্রাম/কেজি বীজ]

বীজ প্রক্রিয়াজাত করণ

তুলাবীজ থেকে অতিরিক্ত তুলা (ফাজ) সরানোর কয়েকটি পদ্ধতি আছে।

১। শারীরিক পদ্ধতি (Phsical Meltod) : শুকনো গোবর অথবা ছাই দিয়ে ঘষে বীজ থেকে আঁশগুলো সয়িে ফেলা হয়।
২। যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical Method) : বিশেষ একধরণের যন্তের সাহায্যে তুলাবীজ থেকে আঁশ বিচ্ছিন্ন করা হয়-
৩। রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical Method) : এই পদ্ধতিতে HCl, H_2SO_4 ব্যবহার করে তুলাবীজ আঁশ মুক্ত করা হয়।
বীজ বপন পদ্ধতির তুলাবীজ সারিতে বপন করা হয়। সারি থেকে সারি দূরত্ব : ৯০-১০০ সে.মি. গাছ থেকে গাছ দূরত্ব : ৪৫-৫০ সে.মি. নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্তে ১-২ সে.মি. গভীর ৩-৪টি বীজ বপন করা হয়।

তুলার জাত

তুলার বিভিন্ন জাত উদ্ভাবিত হয়ে যেমন : সিবি-১, সিবি-২, সিবি-৩, সিবি-৫, সিবি-৯, সিবি-১০, সিবি-১২, সিবি-১৩, সিবি-১৪, শুভ্র, হীরা হাইব্রিড, রূপালী-১, ডিএম-২, ৩, পাহাড়ি তুলা-১ ও পাহাড়ি তুলা-২, এই জাতগুলোর মধ্যে ৫টি জাতের কিছু বৈশিষ্ট্য নিচের সারণীতে দেওয়া হল।

জাত (সিবি-১)	জীবনকাল (দিন)	ফলন (টন/হেক্টর)	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
(ডেল্টা পাইন-১০)	১৭০-১৮০	১.৮-২-১	বেশি আঁশ হয় ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী
সিবি-৩ (ডেল্টাপাইন-৫০)	১৬০-১৭০	২.০-২-৩	ব্লাইট বোক প্রতিরোধী
সিবি-৫	১৮০-১৯৫	১.৮-২.০	শুয়াযুক্ত, আঁশবেশী
সিবি-৯	১৮০-১৫	২.১-২.৪	শুয়াযুক্ত, বোল সাইজ বড়
সিবি-১০	১৫০-১৬০	১.৬-১.৮	আগাম ফসল তোলা যায়

সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগের অধিক ফলন পেতে হলে এবং উন্নত মানের আঁশ এর জন্য সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। নিচে তুলা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের নাম ও পরিমাণ উল্লেখ করা হল।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)
১। জৈব সার[/গোবর/জৈবসার]	৫-৬ টন
২। ইউরিয়া	২০০-২৫০ কেজি
৩। টি এস পি	১৫০-১৭৫ কেজি
৪। এমপি	১৫-১৭৫ কেজি
৫। জিপসাম	৮০-১০০ কেজি
৬। জিঙ্ক সালফেট	১০-২০ কেজি
৭। বোরাক্স	১০-২০ কেজি
৮। ডলোচুন [অম্লিয় মাটিতে]	২-৩ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : জমিতে শেষ চাষ দেয়ার পর এক-চতুর্থাংশ ইউরিয়া অর্ধেক এমপি সার এবং অন্যন্য সারসমূহ সম্পূর্ণ অংশই জমিতে প্রয়োগ করতে হবে; বাকী ইউরিয়া ও এমপি সার সমান তিনভাগে ভাগ করে তুলাগাছের বয়স ২০-২৫ দিন হলে প্রথম বার, ৪০-৫০ দিন হলে দ্বিতীয় বার এবং ৬০-৭০ দিন হলে তৃতীয় বার পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

১। চারা পাতলাকরণ : চারা গজানোর ২০ দিন পর একটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে অবশিষ্ট চারাগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

২। আগাছা দমন : প্রয়োজন অনুযায়ী ২-৩ বার আগাছা দমন করতে হবে। এসময় আগাছা দমনের সাথে সাথে গাছের গোড়া ও সারির মাঝের মাটির আলগা করে দিতে হবে।

৩। সেচ ও নিকাশ : তুলা চাষের জন্য প্রায় ৭০-৯০ সেমি পানি প্রয়োজন। তাই মাটিতে রস না থাকলে সাথে সাথে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে জলাবদ্ধতা যেন সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। পানি যেন না জমতে পারে সেজন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে।

তুলার পোকামাকড় ও বালাই ব্যবস্থাপনা

তুলা ফসলে বিভিন্ন পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়ে থাকে। নিচের তালিকায় কিছু অনিষ্টকারী পোকার নাম ও দমন ব্যবস্থা দেয়া হল।

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম
ক) রস শোষণকারী পোকা : জাব পোকা, জ্যাসিড, সাদা মাছি, থ্রিপস, লাল গান্ধি পোকা	সাকসেস ১.৫ গ্রাম/সি পানি, টাকগর ৪০ ইসি-২ মিলি/লি পানি, কার্বোসালফার ২০
খ) চর্বনকারী পোকা : বোলওয়ার্ম, লিফ রোলার, সেমিলূপার	রিপকর্ড, সিন্থুস, ডেসিস, সুমিডাইডিন

তুলার রোগ : প্রধান রোগ হলে অ্যানথ্রাকনোজ, ড্যাম্পিং অফ বা ঢলে পড়া রোগ ইত্যাদি। এসব রোগ দমনের জন্য ভিটাভেক্স ২০০, কিউপ্রভিট/ ডাইমেন এম ৪৫, টিল্ট ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

তুলা সংগ্রহ

অধিক ফলন ও ভালমানের আঁশ পেতে হলে তুলা সংগ্রহের সময় কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

১। শুধুমাত্র পরিপক্ক বল থেকে তুলা সংগ্রহ করতে হবে বল ফেটে তুলা বের হলেই বল পরিপক্ক হয়েছে বুঝতে হবে। বল ফেটে তুলা বের হলেই বল পরিপক্ক হয়েছে বুঝতে হবে।

২। সাধারণ বীজ বপনের ৫-৬ মাস পর তুলা সংগ্রহ করা যায়। ফুল ফোটার ৫০-১০০ দিনের মধ্যে বল পরিপক্ক হয়।

৩। বল পরিপক্ক হলে দেরি না করে সংগ্রহ করে ফেলতে হবে তা না হলে তুলায় ময়লা লেগে তুলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৪। তিনবার তুলা সংগ্রহ করতে হয়। যখন ৩০-৪০% বল ফেটে যায় তখনই প্রথমবারের মত তুলা সংগ্রহ করতে হবে। এরপর ১৫-২০ দিন পর পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিতে বাকী সব তুলা সংগ্রহ করতে হবে।

৫। বল সংগ্রহের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন ধূলাবালি, ময়লা বা শুকনা পাতা বলের সাথে লেগে না থাকে।

৬। রোগ বলা দ্বারা আক্রান্ত বল এবং ভাল তুলা আলাদা ভাবে উঠাতে হবে। তুলা ৩-৪ বার রোদে শুকিয়ে গুদাম জাত করতে হবে।

৭। খারাপ ও নষ্ট বীজতুলা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮। তবে ফাটা বল প্রায় এক সপ্তাহ গাছে রেখে শুকাতে পারলে আঁশ গুণগতমান আরও উন্নত হয়।

তুলা সংগ্রহের সময় রৌদ্র উজ্বল দিন তুলা সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত রবি মৌসুমে তুলা কার্তিক-অগ্রাহায়ণ মাসে এবং খরিফ মৌসুমের তুলা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সংগ্রহ করা হয়।

ফলন হেক্টর প্রতি ১.৩-১.৬ টন (Ginning and Bailing)

জিনিং ও গাট বাধা : তুলার বল থেকে যে তুলা পাওয়া যয় তাকে বীজতুলা বলে। এখানে বীজ ও তুলা একসাথে থাকে। জিনিং (Ginning) শব্দের অর্থ হলো বীজ তুলা থেকে বীজ আলাদা করা। জিনিং করার পর যে তুলা পাওয়া যায় (বাণিজ্যিক তুলা) তাকে লিন্ট (Lint) বলে। সাধারণত মেশিনের মাধ্যমে জিনিং করা হয়। মেশিনগুলো হল রোলার (Roller) জিনিং করা হয়। মেশিনগুলো হল (Roller) জিন এবং 'স' (Saw) জিন। বীজতুলা থেকে আঁশ হাড়িয়ে নেয়ার পরও বীজের গায়ে যে ছোট ছোট আঁশ লেগে থাকে তাকে ফাজ বলা হয়। জিনিং এর পর যে বীজ পাওয়া যায় তাকে তুল বীজ বলে। শুষ্ক তুলার ৮% বা তার কম আর্দ্রতা থাকে। জিনিং করার পর প্রাপ্ত তুলাকে বেল প্রেসের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে বেল বা গাঠ বাঁধা হয়।

তুলাপ্রক্রিয়াজাতকরণে জিনিং আউট টার্ণ (Ginning out turn) এবং কাউন্ট সংখ্যা (Count Number)

জিনিং আউট টার্ণ : জিনিং আউনট টার্ণ বলতে কোন তুলার জাতের বীজতুলার আঁশ ও বীজের অনুপাতকে বোঝায়, অন্যভাবে বলা যায়। বীজতুলায় শতকরা কতভাগ আঁশ বের করা যায় তাকেই জিনিং আউট টার্ণ বলে। বা জিওটি (GOT)। একটি তুলারজাতের GOT ৩৫% এর অর্থ হল ঐ জাতের ১০০০ কেজি বীজতুলা জিনিং করলে ৩৫ কেজি আঁশ বা লিন্ট পাওয়া যায়।

$$\text{জিওটি GOT} = \frac{\text{আঁশ} \times ১০০}{\text{বীজতুলা}}$$

কাউন্ট সংখ্যা : ১ পাউন্ড তুলার নমুনা থেকে তৈরি করা ৮৪০ গজ (বা ৭৬৮ মিটার) দৈর্ঘ্যের সুতা দিয়ে যে কয়টি মোড়া (Hank) তৈরি করা যায় তার সংখ্যাকে ঐ তুলার কাউন্ট সংখ্যা বলা হয়। বাজারে একে ৪০, ৬০, ৮০, ১০০ এবং ২০০ পর্যন্ত কাউন্টের সুতা হিসাবে অভিহীত করা হয়। তুলার কাউন্ট সংখ্যা যত বেশি হবে তার থেকে তৈরি কাপড় তত বেশি মসৃণ, সিল্কের মত ও দামী হবে। মসলিন কাপড়ের সুতা এত মসৃন ও সুষ্ট ছিল যে মাত্র ৫০০ গ্রাম তুলা থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দীর্ঘ সুতা তৈরি করা যেত।

তুলা বীজ সংরক্ষণ : তুলা গাছের মাঝের ও নিচের দিকের পরিপক্ক বল থেকে যে তুলাবীজ সংগ্রহ করা হয় তার গুণগত মান সবচেয়ে ভাল, বীজ থেকে আঁশ হাড়িয়ে নেওয়ার পর ২-৩ দিন এই বীজ ভালভাবে রোদে শুকাতে হবে যখন বীজের আর্দ্রতা ৭-৮% হবে তখন শুকানো বীজগুলোর ছায়ায় ঠান্ড করে বায়ুরোধক কোন পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

তুলার ব্যবহার

তুলা একটি অতি প্রয়োজনীয় আঁশ জাতীয় ফসল। নীচে এর কিছু ব্যবহার উল্লেখ করা হল।

১। তুলা সুতা ও বস্ত্র তৈরির ব্যবহৃত হয়
২। তুলা বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়।
৩। তুলা বীজের তল লুব্রিকেন্ট, সাবানও পেইন্ট শিল্পে ব্যবহাত হয়।
৪। তুলা বীজের তেল ভোজ্য তেল হিসাবেও ব্যহৃত হয়।
৫। বীজ থেকে তেল বের করার পর যে খৈল পাওয়া যায় তা পশুখাদ্য ও জৈবসার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
৬। শুকনা গাছ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়
৭। তুলা দিয়ে লেপ, বালিশ, তোষক তৈরি করা হয়।

তুলার ক্ষতিকর পোকা ও তার দমন ব্যবস্থাপনা

১। জ্যাসিড পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : চারা গজানোর ২-৩ সপ্তাহ পর থেকেই এদের আক্রমণ শুরু হয়। নিম্ফ ও পূর্ণবয়স্ক উভয় পোকাই পাতার রস শোষণ করে যায় এবং ফলে পাতা হলদে এবং পরে লালচে হয়ে যায়।

প্রতিকার : সাকসেস ১.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে স্প্রে করতে হবে।

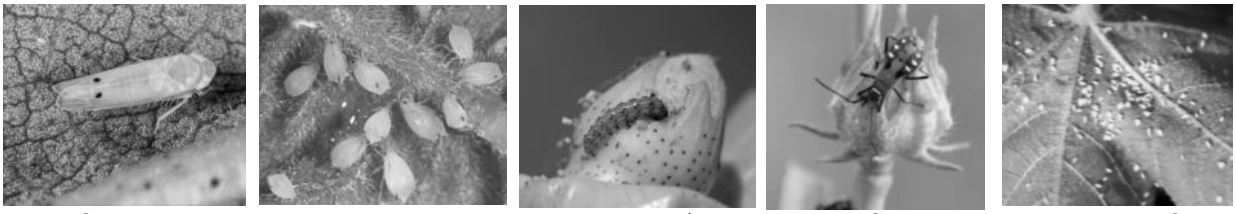

জ্যাসিড পোকা জাব পোকা বোল ওয়ার্ম লাল গান্ধি পোকা তুলার সাদা মাছি

চিত্র ৭.৮.২ : তুলার ক্ষতিকর পোকা

২। জাব পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : নিম্ফ ও পূর্ণবয়স্ক উভয় পোকাই গাছের কান্ড ও পাতা থেকে রস চুষে খায়। ফলে পাতা কুঁকড়ে যায় এবং ডগায় আক্রমণ করলে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থা

ক) পোকা প্রতিরোধী জাত চাষ করতে হবে।

খ) ভোর বেলা জমিতে ছাই ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।

৩। বোল ওয়ার্ম

লক্ষণ : ৫-৬ সপ্তাহ বয়সী তুলাগাছের এই পোকার লার্ভা গাছের ডগা, কুড়ি, ফুল বা বোলছিদ্র করে দেয়। এতে গাছের ডগা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। ফুল, কুড়ি বা কচি বোল মাটিতে ঝরে পড়ে ও ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

দমন ব্যবস্থা

ক) জমি গভীর চাষ দিয়ে রোদে শুকাতে হবে। এতে পোকা, লার্ভা বা শুককীট মরে যায় ও পাখিতে খেয়ে ফেলে

খ) জমির আশপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে হবে

গ) ঝরে পড়া কুড়ি, ফুল ও বোল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ঘ) আলোর ফাঁদ দিয়ে বোল ওয়ার্ম পোকার মথ ধরতে হবে।

ঙ) ফেনডেলারেট ২০ তরল ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪। লাল গান্ধি পোকা

ক্ষতির লক্ষণ : পূর্ণবয়স্ক পোকা গাছের পাতা, কুড়ি, ফুল ও বল থেকে রস চুষে খায়। ফলে বোলের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, তুলার আঁশ হলদে হয়ে যায় এবং বীজ নষ্ট হয়।

প্রতিকার

ক) ডিমের গাদা ও লার্ভা/ক্রীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে

খ) পাখি যেন পোকা খেতে পারে তাই জমির পাশে ডাল পুঁতে দিতে হবে।

গ) কার্বোসালফান ২০ তরল ২ মি.লি. ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৫। তুলার সাদা মাছি

ক্ষতির ধরণ : সাদা মাছি পাতার রস শোষণ করে, এরা পাতার উপর এক ধরনর মধুকণা নি:সরণ করে, ফলে সেখানে সুটি মোল্ড ছত্রাক জন্মায়। এর আঠালো পদার্থ তুলার লিন্টের সাথে লেগে লিন্টের গুণগত মান নষ্ট হয়।

প্রতিকার : ক্লোরোপাইরিফস ২০ তরল ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

তুলার রোগ ও তার দমন পদ্ধতি

১। চারা গাছের রোগ

রোগের লক্ষণ : ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়। গজানোর পূর্বেই বীজ পঁচে যায়। অংকুরিত চারার ভূমি সংলগ্ন স্থানে পচে যায় গাছের শিকড় পচে যায় এবং অবশেষে চারার গাছ মারা যায়।

দমন ব্যবস্থা

ক) বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

খ) জমিতে পানি যেন না জমে সেজন্য জমি সুনিষ্কাশিত হতে হবে।

গ) আক্রান্ত জমিতে কুপ্রাভিট, ডায়থেন এম ৪৫ ইত্যাদি ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

২। এ্যানথ্রাকনোজ রোগ

লক্ষণ : ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। চারাগাছের বীজপত্র ও পাতায় ছোট ছোট লালচে দাগ পড়ে। বয়স্ক গাছের কান্ডে লম্বা বাদামি দাগ পড়ে ও বাকল ফেটে যায়। কচি বোলের উপর পানি ভেজা লালচে কিনারাযুক্ত বসে যাওয়া দাগ দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

ক) আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে

খ) ভিটাভেক্স দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।

গ) বোল গঠনের পর ১% বোর্দোমিক্সার ১-২ বার প্রয়োগ করতে হবে।

৩। ফিউজেরিয়াম উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ

লক্ষণ : *Fusarum oxysporum* বা *F. vasinhectum* ছত্রাক দিয়ে এই রোগ হয়। চারাগাছের পাতা প্রথমে হলুদ ও পরে বাদামি হয়ে যায় এবং চারা গাছ দ্রুত ঢলে পড়ে ও মারা যায়। আক্রান্ত অংশ কাটলে ভিতরে কালো রিং দেখতে পাওয়া যায়।

দমন ব্যবস্থা

ক) বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নিতে হয়ে

খ) কু প্রাভিট-৫০, ডাইমন এম ৪৫, কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করতে হবে।

৪। পাতায় দাগ পড়া রোগ

লক্ষণ ছত্রাকের দ্বারা এ রোগ হয়। পাতায় গোলাকার দাগ দেখা যা এবং আক্রান্ত স্থান খসে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা :

ক) আক্রান্ত পাতা ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

খ) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে অথবা বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৫। ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট : ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই রোগ হয়। *Xanthomonas Malvacearum*

লক্ষণ : প্রথম লক্ষণ দেখা যায় চারা গাছের বীজপত্রে। বীজপত্রে নিজের দিকে গোল গোল পানি ভেজা দাগ যায় এবং বীজপত্র ঝরে পড়ে। বয়স্ক গাছের পাতায়ও পানিভেজা দাগ দেখা যায়। বোল আক্রান্ত হলে তাতেও কালো বা বাদামী পানি ভেজা দাগ সৃষ্টি হয় এবং আক্রান্ত বোল ঝরে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা :

ক) ফসল কাটার পর বাকী অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

খ) সালফিউরিক এসিড দিয়ে বীজ ডিলিলেড করতে হবে।

৬। বোল পঁচা রোগ :

লক্ষণ : বিভিন্ন ছত্রাক এ পোকার জন্য দায়ী এ রোগ তুলার রোল আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত বোল পুড়িয়ে কালো হয়ে যায় এবং রোল ফাটতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বোল ফাটলেও তুলা কালো হয়ে যায়।

প্রতিকার :

ক) বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

খ) আক্রান্ত জমিতে ২.৫ গ্রাম ডায়থেন এম ৪৫ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	তুলা সংগ্রহ ও তুলা প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন জমা দিবে।

সারাংশ

তুলা একটি গুরুত্বপূর্ণ আঁশ জাতীয় ফসল। উন্নতমানের আঁশ পেতে হলে তুলা সংগ্রহ ও তুলা প্রক্রিয়াজাতকরণ খুবই সতর্কতার সাথে সঠিক পদ্ধতিতে করতে হবে। সংগৃহীত তুলা সংরক্ষণও যথাযথভাবে করতে হবে। আমাদের বস্ত্রশিল্পের অন্যতম কাঁচামাল এই তুলার বহুবিধ ব্যবহারের জন্য এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন ধরনের বল তুলা সংগ্রহের জন্য উত্তম?

ক) কচি বল খ) পরিপক্ক বল

গ) আধা-পরিপক্ক বল ঘ) অতিরিক্ত পরিপক্ক বল।

২. বীজ তুলা হতে আঁশ ছাড়ানোকে কি বলে?

ক) গাঁট বাঁধা খ) জিনিং

গ) জিওটি ঘ) ফাজ।

৩. সংরক্ষণের জন্য তুলাবীজের আর্দ্রতা কত হবে?

ক) ৪-৫% খ) ৫-৬%

গ) ৬-৭% ঘ) ৭-৮%

পাঠ-৭.৯ ব্যবহারিক : সুস্থ বীজ বাছাইকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বীজ বাছাইয়ের গুরুত্ব জানতে পারবেন;
- সুস্থ বীজ বাছাই করতে পারবেন;
- বীজ বাছাই করতে কি কি উপকরণ লাগে তা জানতে পারবেন।

মূলতত্ত্ব : বীজ ফসল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ফসলের ফলন নির্ভর করে সুস্থ বীজের উপর। বীজের মধ্যে অপুষ্ট বীজ, রোগাক্রান্ত বীজ, বিবর্ণ বীজ না থাকাকে সুস্থ বীজ বুঝায়। কারণ অপুষ্ট বীজ থেকে দূর্বল চারা উৎপন্ন হয় না মাঠে ভালো ফলন দিতে অক্ষম। তাই বীজে বপনের পূর্বে অবশ্যই ভালো সুস্থ বীজ বাছাই করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. বপনের জন্য নির্বাচিত ধান বীজ
২. পানি
৩. বালতি/ চৌবাচ্চা
৪. ইউরিয়া সার
৫. লোহা বা কাঠের দন্ড
৬. চালনী

কার্যপদ্ধতি

১. প্রথমে একটি বড় বালতিতে ১৩ লিটার পরিস্কার পানি নিতে হবে।
২. এরপর বালতির পানিতে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার ঢেলে দিয়ে দন্ডের সাহায্যে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে সমস্ত ইউরিয়া দ্রবীভূত হয়।
৩. ইউরিয়া দ্রবণে ধানের বীজ (২০ কেজি) ঢেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে।
৪. পুষ্ট ভারী বীজ বালতির তলদেশে ডুবে যাবে।
৫. অপুষ্ট বীজ ও চিটা দ্রবণের উপরিভাগে ভেসে উঠবে।
৬. ভাসমান চিটা ও অপুষ্ট বীজ চালনীর মাধ্যমে বা হাত দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।
৭. বালতির তলায় ডুবে থাকা বীজগুলো উঠিয়ে পরিস্কার পানিতে ৩-৪ বার ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। এ বীজ বীজতলায় বপন করা যাবে অথবা জাগ দেয়া যাবে।

সাবধানতা

১. ইউরিয়া ও পানির অনুপাত সঠিক হতে হবে (১-১.৫: ৪০)
২. বীজ পানিতে ঢেলে ভালোভাবে নাড়তে হবে।
৩. বাছাইকৃত বীজ পরে ব্যবহার করতে হলে তা অবশ্যই দ্রুত পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কৃষক লিটু মিয়া বাড়ীর পাশের লিখন মিয়াকে দেখে তার জমিতে মসুর ডাল চাষ করেন এবং জীবানু সার ব্যবহার করেন। এতে ডালের ফলন পূর্বের তুলনায় বেশি হয় এবং উৎপাদন খরচও কম হয়।
ক) প্রতি হেক্টরে মসুরের ফলন কত হয়?
খ) জীবানুসার কীভাবে ফলন বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?
গ) বপন সময় ফলন বৃদ্ধিতে কী প্রভাব ফেলে?
ঘ) লিটু মিয়ার লিখন মিয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২। কৃষক রাশেদ মিয়া তার জমিতে সয়াবিনের লোকাল জাত চাষ করতেন। কিন্তু এবার কৃষক আরিফ মিয়ার সাথে কথা বলে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার শরনাপন্ন হন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জাতের সয়াবিন চাষ করে খুব লাভবান হোন।
ক) সয়াবিনের ৩টি উন্নত জাতের নাম লিখুন।
খ) কৃষক রাশেদ কৃষক আরিফের সাথে কথা বলতে গেলেন কেন?
গ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কৃষক রাশেদকে সয়াবিন চাষে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
ঘ) কৃষক রাশেদের সয়াবিন চাষে লাভবান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩। দেশে পাটের দাম কমে যাওয়ায় চাষীরা পাট চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় কৃষি কর্মকর্তারা পাট চাষের উপর চাষীদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী নেয়। ফলে চাষীদের পাট চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণের পাট থেকে বিভিন্ন শিল্প কর্ম তৈরি ও রপ্তানি সুযোগ সম্পর্কে চাষীদেরকে শিক্ষা দেন। তারা তাই পাট চাষ বাড়ানোর ব্যাপারে চাষীদেরকে উৎসাহিত করেন।
ক) পাটের দুটো জাতের নাম লিখুন।
খ) পাটের বীজ বপনের সময় সম্পর্কে লিখুন।
গ) পাট দিয়ে কোন কোন শিল্প পণ্য তৈরি হয় ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) পাট নিয়ে কৃষি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করুন।

৪। আখ চাষী রহিম গতানুগতিক পদ্ধতিতে আখ চাষ করায় ফলন কম হয়। পরবর্তীতে তিনি আখ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করেন। ফলে আখের ফলন বেড়েছে। পরের বছর ঐ গ্রামের কৃষকেরা রহিমের পরামর্শমত রোপনের আগে আখ খন্ড শোধন করে নিয়ে জমিতে লাগান এবং বেশি ফলন পেয়ে লাভবান হন।
ক) আখের দুটি জাতের নাম লিখুন।
খ) আখের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
গ) রহিম চাষির আখ রোপনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করুন।
ঘ) রহিম ও তার গ্রামের চাষিদের কাজের মূল্যায়ন করুন।

৫। চান মিয়া তুলা চাষ করেন কয়েকবছর ধরে। এ বছর তার জমিতে তুলা গাছে বোল ধরার পর একধরনের পোকা দেখতে পান। কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে চান মিয়া পোকা দমনের জন্য যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনে সক্ষম হন। ফলে তুলার ফলন হ্রাসের ক্ষতি থেকে রক্ষা পান।
ক) তুলার জিনিং কী?
খ) তুলা চাষে কেমন মাটি প্রয়োজন তা বর্ণনা করুন।
গ) চান মিয়া তুলা ক্ষেতে পোকা কীভাবে দমন করলেন ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) চান মিয়া তুলার ফলন হ্রাসের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২ : ১। খ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩ : ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪ : ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭ : ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮ : ১। খ ২। খ ৩। ঘ